রাজশেখর সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।' আর শিষ্যের লেখা সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তি: 'এই বুড়া বয়সে তোমার গল্প পড়িয়া হাসিতে হাসিতে choked হইয়াছি।' রসরাজ অমৃতলাল বসু অযাচিতভাবে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন : 'আপনি এত ভাল লেখেন— এত ভাল? কি লজ্জা যে আমি এতদিন কিছু পড়িনি।... যে-ভাবে চরিত্র ফলাতে বর্ণনাদি দিতে আপনি পারেন, দৈবশক্তি (genius) সম্পন্ন না হলে কেউ তা পারেন না।... যদি আপনার মতো লিখতে পারতাম।' সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য: 'আমি পৃথিবীর কোনো সাহিত্য আমার পড়া থেকে বাদ দিই নি। রাজশেখরবাবু যে কোনো সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত। এ কথা বলার অধিকার আমার আছে।' রাজশেখর নিজের সম্পর্কে বলতেন: 'আসলে আমি আধা মিস্ত্রি, আধা কেরাণী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরাণীর কাজ।' নিজের গল্প সম্বন্ধে বলতেন, 'আমার পুঁজি বেশি নয়।' সারাজীবন অতি মিতভাষী ও মিতাচারী মানুষটি নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইলেও আক্ষরিক অর্থে তিনি একজন মহৎস্রষ্টা। বিরল-ব্যক্তিত্ব ও বিরল-প্রতিভার অধিকারী।

এই মানুষটির জীবনকাহিনী এ গ্রন্থ। জানা-অজানা তথ্য নিয়ে রাজশেখর বা পরশুরাম-চর্চায় কাজে আসবেই এ-বই।

হেমন্তকুমার আঢ্য পেশায় অধ্যাপক। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর দুটি গ্রন্থ সুকুমার রায় : জীবনকথা (১৯৯০); উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৯৯৭)।

মূল্য : ৪০ টাকা

ISBN : 978-260-2513-8

978-260-2513-8

ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

রাজশেখর বসু

হেমন্তকুমার আঢ্য

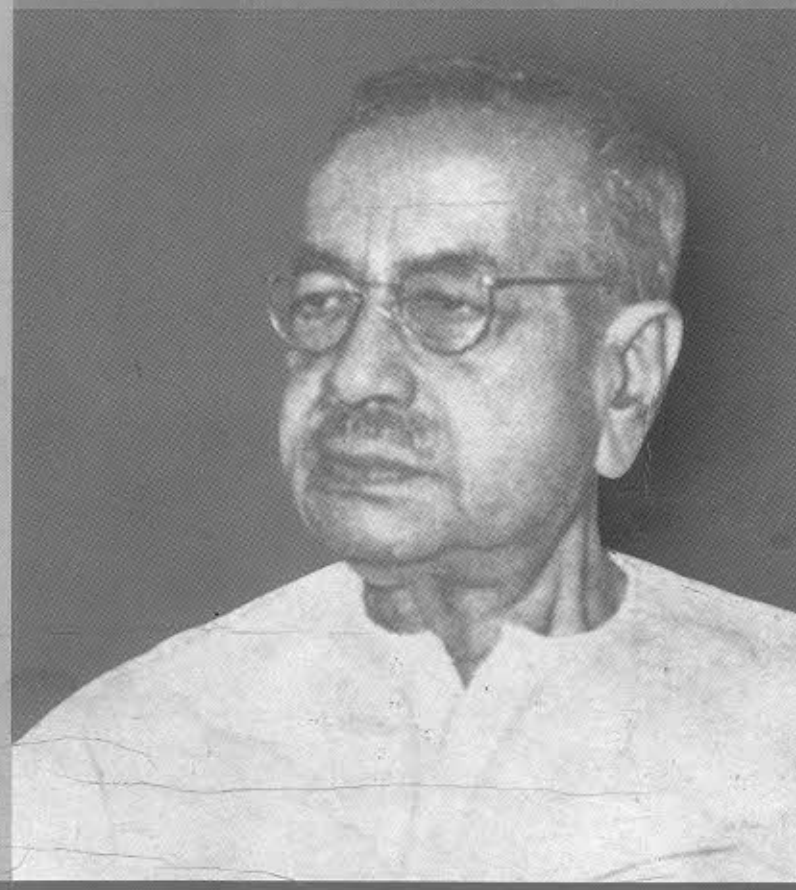

বই বইয়ের ঠিকানা

ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

রাজশেখর বসু

হেমন্তকুমার আঢ্য

সাহিত্য অকাদেমি

বই বইয়ের ঠিকানা

Rajsekher Basu : A monograph in Bengali by Hemanta Kumar Adhya.
Sahitya Akademi, Second Printing 2007. Price : Rs. 40.

© সাহিত্য অকাদেমি
ISBN 978-260-2513-8

প্রথম প্রকাশ ২০০১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৭

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
বিক্রয়কেন্দ্র : স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
জীবন তারা, ২৩এ/৪৪ একস, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
মেইন গুণ বিল্ডিং কমপ্লেক্স, ৪৪৩ (৩০৪) আন্না সলাই, তেয়নামপেট, চেন্নাই ৬০০ ০১৮
সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ড. বি. আর. আম্বেদকর ভীধি, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রক
শান্তি প্যাকার্স, ১৫/১ মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

জীবনকথা ১
সাহিত্য-প্রসঙ্গ ২৯
রাজশেখর বসু : তথ্যপঞ্জি ৩৯
রাজশেখর বসু : রচনাপঞ্জি ৪৬
পরশুরামকে নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কৃত্রিম মসিযুদ্ধ ৪৮
'পরশুরাম-প্রশস্তি' : যতীন্দ্রকুমার সেন ৫১
রাজশেখর : নানা চোখে ৫৩
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৬০

বই বইয়ের ঠিকানা

জীবনকথা

১

রাজশেখর বসুর একটি লেখায় তাঁদের পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত আছে এই ভাবে : 'ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করছি, বাবা প্রশ্ন করলেন, কি বই পড়ছ? উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

— কোনখানটা।

— মোগল সম্রাটদের বংশ। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, তাঁর পুত্র আকবর, তারপর জাহাঙ্গির শাজাহান আরংজিব।

— হয়েছে, হয়েছে। নিজের পিতামহের নাম জান? শুনেছিলাম আমার ঠাকুদ্দা নেপোলিয়ন আর রণজিৎ সিংহের আমলের লোক, কিন্তু তাঁর নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না। বললাম ভুলে গেছি।

— লিখে নাও। তোমার পিতামহ কালিদাস বসু, প্রপিতামহ গুরুদাস, বৃদ্ধ প্রপিতামহ রত্নেশ্বর, অতিবৃদ্ধ রামসন্তোষ, অতি অতিবৃদ্ধ রামভদ্র। গড় গড় করে ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নাম করে বাবা বললেন, মুখস্থ করবে, ভুলে যেয়ো না যেন। এঁরা মোগল বাদশাহের চাইতে তোমার ঢের বেশী আপনজন।' (সমদৃষ্টি)

এই অংশটি রাজশেখরের 'বিচিত্রা' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ হলেও উপরের প্রতিটি তথ্যই বর্ণেবর্ণে সত্য। সেকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে অনেকেই পূর্বপুরুষের নাম লিখে রাখার সঙ্গে মুখস্থও রাখতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন ঈশ্বর স্মরণের সঙ্গে পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে রচিত শ্লোক আবৃত্তি করতেন : '.... নীলমণের্রামলোচনঃ / রামলোচনঃ দ্বারকানাথঃ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যোঃ।'[১]

পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে আগ্রহ, সম্মান-প্রদর্শন — ব্যক্তিত্ব-বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর তাই সযত্নে, প্রচুর পরিশ্রম করে কুলজি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

২

চন্দ্রশেখরের লেখা 'ধবু বসু বংশ পত্রিকা' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। চন্দ্রশেখর প্রচুর পরিশ্রমে এই কুলজি-গ্রন্থ তৈরি করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করেন। হিন্দুশাস্ত্রে কায়স্থদের স্থান, কান্যকুব্জ থেকে রাজা আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গসহ সন্তানাদিসমেত নিজের বিস্তৃতি বংশ-পরিচয় গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর আত্মীয়রা বা স্ব-জাতীয় কায়স্থরা যাতে অন্যান্য শাখার বিবরণ সংগ্রহে

বই বইয়ের ঠিকানা

আগ্রহী হন — এই গ্রন্থে তারও অনুরোধ রেখেছেন। প্রায় লুপ্ত এই গ্রন্থটি থেকে কিছু উদ্ধার করা যায় :

'... আমার পিতাঠাকুর ৺কালিদাস বসু ... আমার বাল্যকালে আমাকে পূর্বপুরুষের নামগোত্র, পর্য্যায় ভাব প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন।'

'গৌড়দেশস্থ ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ বংশের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিসুরের যজ্ঞ বিষয়ক কিছু কিছু সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন।'

'মহারাজ আদিসুর বর্ষানুষ্ঠান নামক রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্পপূর্বক কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহকে পঞ্চগোত্রের সস্ত্রীক পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ পাঠাইতে লেখেন। তদনুসারে পঞ্চজন সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ শ্রুতিজ্ঞ, সুগতজীত পঞ্চগোত্রীয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন পঞ্চগোত্রীয় যাজ্ঞিক কায়স্থ সদারাপত্য প্রেরণ করেন।'

'ধবু বসুর [ধ্রুব বসু?] যে বংশাবলি আমি পশ্চাতে লিখিতেছি তাহা আমার প্রপিতামহের [রত্নেশ্বর বসু] সংগৃহীত।'

রাজশেখরের জন্ম এই বংশের ছাব্বিশতম পর্যায়ে।

৩

চন্দ্রশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী একমাত্র 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা এই গ্রন্থ থেকে চন্দ্রশেখর সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় :

'১২৪০ সালের ৮ই শ্রাবণ, জেলা নদীয়ার উলাগ্রামে চন্দ্রশেখর বসুর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস বসু এবং কৌলিন্য পর্য্যায় পঁচিশ। ইঁহারা মাইনগর নিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তৌফী বাটীতে বিবাহ করেন। তৎকালে মুস্তৌফী বংশ মহা প্রতাপান্বিত ছিল। তাঁহারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে 'মুস্তৌফী' খেতাব পাইয়াছিলেন। উক্ত বিবাহ উপলক্ষে মুস্তৌফীদিগের স্টেট হইতে ভূম্যাদি সম্পত্তি পাইয়া চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি তাঁহাদের ভবনে বাস করেন এবং এ পর্য্যন্ত সেখানেই চন্দ্রশেখর স্বীয় বংশের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন।'[২]

অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে চন্দ্রশেখর বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেলফ্ মেড ম্যান' চন্দ্রশেখর ছিলেন তাই। যশোলক্ষ্মী সৌভাগ্যলক্ষ্মী দুয়ের প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন।

তাঁর চাকুরি তথা কর্মজীবন প্রায় চুয়াল্লিশ বছর। তিরিশ বছর দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং ও অল্প কিছুদিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে রাজ এস্টেটের ম্যানেজার রূপে কাজ করেছেন। তাঁর আগেও দ্বারভাঙ্গায় চাকুরি মাঝে ছেড়ে এসে অন্যত্র কিছু কিছু চাকুরি করেছেন। এর মধ্যে আছে বরিশালের পোস্ট অফিস, বর্ধমান কালেকটরিতে প্রথমে সেকেন্ড ক্লার্ক পরে হেড ক্লার্ক, নীলউৎপাদক মীরগঞ্জ কনসার্ন — ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর ছিলেন ধীর স্বভাব, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। তাঁর নিয়োগকর্তারা বা ওপরওয়ালারা তাঁর ওপর নানা কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। চন্দ্রশেখর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারভাঙ্গার রাজ এস্টেটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। লক্ষ্মীশ্বর সিং-এর পরবর্তী মহারাজার (লক্ষ্মীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র) সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। একথা উল্লেখ করেছেন দ্বারভাঙ্গাবাসী স্মরণীয়-কীর্তি লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনিও পরবর্তীকালে এই এস্টেটে চাকরি করেছেন।

উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফাঁকে চন্দ্রশেখর ধর্ম, দর্শন, পুরাণ ইঃ নিয়ে চর্চা করতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছাড়াও সেকালের আর কিছু পত্রিকায় — এ সব বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নিজেই সাত-আটটি বই প্রকাশ করেছিলেন। যেমন অধিকারতত্ত্ব (১২৮২ বঙ্গাব্দ), বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি (১২৮২), বেদান্ত দর্শন (১২৯২), হিন্দুধর্মের উপদেশ (১২৯১) — ইত্যাদি। 'ধবু বসুর বংশ পত্রিকা' নামে ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থটিতে কায়স্থজাতির ইতিহাস ও নিজের বংশাবলীর বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি 'ধর্মসংসৎ' নামে একটি ধর্মীয় সভা ও 'ব্রাহ্ম ইউনিয়ান' নামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া আরও সৎকর্মের সঙ্গে চন্দ্রশেখর নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

চন্দ্রশেখরের বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। পরিশ্রম করার ক্ষমতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, বিদ্যাচর্চা — এসব গুণ কমবেশি তাঁর সন্তানদের মধ্যে বর্তেছিল। চন্দ্রশেখরের মতোই রাজশেখরের হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতো। পরিচ্ছন্নতা, কর্মে পরিপাট্য, নিষ্ঠা — এ সব গুণও চন্দ্রশেখরের কাছ থেকেই রাজশেখর পেয়েছিলেন। পিতার মতো তিনিও আশি বছর বেঁচেছিলেন।

চন্দ্রশেখরের জন্মস্থান নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কাছে 'উলায়' যার বর্তমান নাম উলা-বীরনগর বা বীরনগর।

'উলা' এই নামকরণের পিছনে যে ধারণা আছে তা হল — একদা এখানে উলুঘাসে ভর্তি বিস্তীর্ণ চরভূমি ছিল। অপর মতে উলাচণ্ডী থেকে এইনাম। এটি নদিয়া জেলার একটি বর্ধিষ্ণু ও প্রাচীন জনপদ। উলা থেকে বীরনগর নামের পিছনে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, তা এরকম : একবার গ্রামবাসীদের কৌশল ও রীতিমতো রোমাঞ্চকর সাহসী চেষ্টায় একটি কুখ্যাত ডাকাতদল এখানে ধরা পড়ে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'বীরনগর' নামকরণের সুপারিশ সরকার মেনে নেন। সুপারিশে ঘটনার

বই বইয়ের ঠিকানা

বিবরণসহ অনুরোধ করা হয়েছিল : 'The name of the village should be changed to Beernagar, that is, the town of heroes' (সুপারিশের তারিখ ২৫ অক্টোবর, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ দ্রঃ সৃজননাথ মিত্রমুস্তৌফী 'উলা বা বীরনগর' পৃ ২১, কলকাতা, ১৩৩৩)[৩]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যালেরিয়ার মহামারীতে উলা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। চন্দ্রশেখরের পিতামাতাও ম্যালেরিয়ায় মারা যান। চন্দ্রশেখর এই সময় কলকাতায় চলে আসেন। দেখাশোনার অভাবে তাঁদের স্থাবর সম্পত্তির অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায়।

৪

চন্দ্রশেখরের তিন বিবাহ। প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় বিয়ের কিছুদিন পর মারা যান। দ্বিতীয় স্ত্রীও একটি কন্যা রেখে অকালে গত হন। এরপর চন্দ্রশেখর ৩০ বছর বয়সে বর্ধমান জেলার বামুন পাড়া গ্রামের নৃত্যগোপাল দত্ত ও জগমণি দত্তের কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহ করেন। রাজশেখর ও তাঁর ভাইবোনেরা লক্ষ্মীমণিরই সন্তান। এঁরা হলেন : ইন্দুমতী, কুমুদবতী, শশিশেখর, উষাবতী, লীলাবতী, রাজশেখর, হিরণ্যবতী, কৃষ্ণশেখর এবং গিরীন্দ্রশেখর।

মা লক্ষ্মীমণিকে রাজশেখর গভীরভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়কেতু বসু লিখেছেন, 'আমার ঠাকুমার সব অনুরোধই তিনি রাখতেন। মেজ জ্যাঠামশাই অসম্ভব মাতৃভক্ত ছিলেন। এ জন্য অনেকে তাঁকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা দিত।'[৪]

রাজশেখরের অগ্রজ শশিশেখরের (১৮৭৪-১৯৫৫) মাত্র দুটি বই আছে ; ইংরেজিতে 'Humourous Sketches' ও বাংলায় 'যা দেখেছি, যা শুনেছি' (১৯৫৫)। দ্বিতীয় বইটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত। বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ইংরেজি বইটি বেরিয়েছিল এলাহাবাদের Pioneer পত্রিকার সম্পাদকের (জে.এস. চেসনি) চেষ্টায়। বাংলা বইটি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজশেখরের চেষ্টায় কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে ছাপা হয়। ভূমিকা লেখেন পরিমল গোস্বামী। দুটি বই-ই সত্যি-মিথ্যে মেশানো কৌতুক-রচনার সংকলন।

শশিশেখরকে দিয়ে ৭৮ বছর বয়সে লিখিয়েছিলেন পরিমল গোস্বামী। এরপর আর তিনবছর বাংলা লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন শশিশেখর। মূলত 'যুগান্তর সাময়িকী'তে শশিশেখরের কৌতুক-চর্চাগুলি প্রকাশিত হত।

শশিশেখর সম্পর্কে আলোচনা খুব একটা নেই। পরিমল গোস্বামী, তাঁর পুত্র শতদল গোস্বামী শশিশেখরের প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া গোপাল হালদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৈয়দ মুজতবা আলীর কিছু মন্তব্য ও আলোচনা পাওয়া যায়।

শশিশেখরের জীবন, কর্ম ও প্রতিভা সম্পর্কে এঁদের রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা যায় : 'দ্বারভাঙ্গা রাজহাইস্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন শশিশেখর।' '...এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শশিশেখর প্রথম পাটনা কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি মোহ না থাকায়, অসমাপ্ত অবস্থায় ছাত্রজীবনের ইতি ঘটান।' ...'তাঁর ৮১ বছরের জীবনে দীর্ঘ ৬৫ বছর নিরলস সাহিত্য রচনা করেছেন প্রধানত ইংরেজি ভাষাতেই। মাত্র ১৬/১৭ বছর বয়স যখন, তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় বিখ্যাত পায়ওনিয়ার পত্রিকায়। এ ছাড়া স্টেটসম্যান, বম্বে ক্রনিকল, বেঙ্গলী, ইন্দু প্রকাশ, ইংলিশম্যান, ডেলি নিউজ, হিন্দু পেট্রিয়ট, ইন্ডিপেনডেন্ট, ইন্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি পত্রিকায় এস. এস. বসু এই নামে নানা বিষয়ে বহু হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর ইংরাজি লেখার স্টাইল ছিল চিত্তাকর্ষক, সহজ সরল অনাড়ম্বর।' '...৭৮ বছর বয়সে শশিশেখর বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন।' 'আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রসিক সমাজে আলোড়ন তুলেছিলেন। তারপর মাত্র তিনবছর বেঁচেছিলেন। এই তিনবছরে তাঁর যত লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এককথায় বলা চলে অসাধারণ, অনবদ্য।'[৫]

পরিমল গোস্বামী শশিশেখর সম্পর্কে লিখেছেন, 'পাটনায় মণীন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত বিহার হেরালডে প্রথম ESOBSS নামক এক অপরিচিত ব্যক্তির লেখা পড়তাম, ভাল লাগত। একদিন মণির [মণীন্দ্র সমাদ্দার] কাছে শুনলাম এ নামটি S.S. Bose উল্টো করে লেখা।' 'ইংরাজীতে তিনি ছিলেন বেপরোয়া ভাবে স্বাধীন। বিহার হেরালডে মাঝে মাঝে এমন লেখা দেখেছি যার বাংলা অনুবাদ ছাপা চলে না।' 'শশিশেখরকে আমিই বাংলা লিখতে প্রলুব্ধ করি।' 'এরকম সরল সরস ভঙ্গী বাংলা ভাষায় খুব বেশী লেখা হয়েছে কী? অথচ শশিশেখরের নাম নেই অধ্যাপকদের লেখা বাংলা হাস্যরসের বইতে।'[৬] সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য, '...শশিশেখরবাবুর লেখা পড়ে আমার নিজের লেখার প্রতি ঘৃণা ধরে। এ লোকটা অত দেরিতে কলম না ধরে যদি যৌবনে আরম্ভ করতেন তবে আর সবাইকে কানা করে দিতেন।'[৭]

রাজশেখরের পরের ভাই কৃষ্ণশেখর (১৮৮৪-১৯৭১) ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল গ্রামোন্নয়নে। তাঁর চেষ্টায় তাঁদের পৈতৃক বাসভূমি উলা-বীরনগরের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। তার আগে উলা-বীরনগর ছিল আর পাঁচটা অনুন্নত গ্রামের মতো। ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে বীরনগর স্টেশন এলাকায় জমি সংগ্রহ করে উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বসু ভ্রাতাদের অর্থসাহায্যে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। ক্রমে পাকা রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্কুল, হাসপাতাল গোটা অঞ্চলটির চেহারা বদলে দেয়। রাজশেখরের প্রস্তাবে সংগৃহীত এলাকার নাম হয় 'নগেন্দ্র পত্তন'। এ সব ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন কৃষ্ণশেখর। 'পল্লী উন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া

বই বইয়ের ঠিকানা

পড়িতেন।' — এ মন্তব্য তাঁর একজন ঘনিষ্ঠের। উৎকেন্দ্র সমিতির আসরে গোপাল হালদারের সঙ্গে পরিচয় হয় কৃষ্ণশেখরের। গোপাল হালদার জানাচ্ছেন, 'একমাত্র কৃষ্ণশেখর বসু' বোধহয় লেখায় হাত দেননি — সরকারি কাজ ছাড়া, এই স্বল্পভাষী মানুষটি হাত দিয়েছিলেন পল্লীসংস্কারে, তাঁর সে চেষ্টায় পূর্বপুরুষের গ্রাম উলো নবজন্ম পেয়েছে 'বীরনগরে'।[৮]

রাজশেখরের আবির্ভাব না হলেও শুধু গিরীন্দ্রশেখরের জন্য বসু পরিবারের নাম থেকে যেত। চন্দ্রশেখরের কনিষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রশেখর কৃতী ছাত্র, বহু গুণের অধিকারী এবং এ দেশে মনোবিদ্যা ও মনোচিকিৎসা-প্রসারের জন্য চিরস্মরণীয়।

গিরীন্দ্রশেখর (১৮৮৭-১৯৫৩) বরাবর মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে দ্বারভাঙ্গা রাজ হাইস্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে এফ.এ. এবং রসায়ন ও শারীরবিদ্যায় ডাবল অনার্স নিয়ে ১৯০৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এসসি পাস করেন। গিরীন্দ্রশেখর বরাবর স্কলারশিপ পেয়ে এসেছেন। বি.এসসি পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এরপর কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ে ১৯১০-এ সেকেন্ড এম.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ। ১৯২১-এ অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি. এস. সি।[৯]

তিনি অধ্যাপনা ছাড়াও মনোবিদ্যার চর্চা ও মনোচিকিৎসার উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে সময়ে এ দেশে মনোরোগ চিকিৎসার কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। গিরীন্দ্রশেখর নিজের উদ্ভাবিত পন্থায় ও কিছুটা ফ্রয়েডিয় ধারায় রোগীর চিকিৎসা করতেন। 'রূপনারায়ণের কূলে' গ্রন্থে গোপাল হালদার জানিয়েছেন, 'তাঁর প্রতিষ্ঠা — মনোবিদ্যায়। ফ্রয়েডের পূর্বেই তিনি ফ্রয়েডীয় ধারায় বিজ্ঞান ও ইচ্ছার অন্তর্বিরোধের তত্ত্বের গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন — 'দ্য কনসেপ্ট অব্ অপোজিট উইশ'কে ফ্রয়েডও সাদরে অভিনন্দিত করেছিলেন। ওঁর প্রধান পরিচয় মনোবিদ্যার অধ্যাপনায় ও মনোরোগের চিকিৎসায় — আর ওঁর সহাস্য সহৃদয়তায়।'[১০]

মনোবিদ্যার অধ্যাপনা, অসংখ্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-রচনা, 'সমীক্ষা' পত্রিকা প্রকাশ, ভারতীয় মনঃ সমীক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ছাড়াও তাঁর অন্যতম কীর্তি 'লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হসপিটাল' প্রতিষ্ঠা।

ফ্রয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি তিনিই প্রথম এদেশে প্রচার করেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর বহু পত্র-বিনিময় হয়েছিল। সেগুলি তিনি স্ব-সম্পাদিত ইংরেজি ('সমীক্ষা') পত্রিকায় প্রকাশ করেন, পরে গ্রন্থাকারেও এগুলি প্রকাশিত হয়। বহুক্ষেত্রে তিনি স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছেন, নতুন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করেছেন। ফ্রয়েডের প্রচার করলেও, বহুক্ষেত্রে নিজের মত-পার্থক্যও নির্দেশ করেছেন। ইংরেজিতে ফ্রয়েডের সব লেখা পাওয়া যেত না বলে, মূল লেখা পড়ার জন্য জার্মানভাষাও শিখেছিলেন।

মনোবিদ্যা ও মনোচিকিৎসায় নিবেদিত-প্রাণ এই মানুষটি যা করেছেন, তাঁর পূর্বে কোনো ভারতীয় সে কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

গিরীন্দ্রশেখরের প্রতিভা বহুমুখী, শুধু মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর পুরাণ তথা ভারতবিদ্যা-চর্চার উদাহরণ 'পুরাণ-প্রবেশ' গ্রন্থটি যা তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফসল ও যার বক্তব্য আজও পাঠককে ভাবাবে। তিনি 'গীতা'র অনুবাদ করেছেন ও এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে। তাঁর 'স্বপ্ন' গ্রন্থটি বাংলায় লেখা বিজ্ঞান-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। ছোটদের জন্য লেখা 'লাল-কালো' গ্রন্থটি-ও শিশুসাহিত্যের সম্পদ। লাল পিঁপড়ে ও কালো ডেঁয়ে পিঁপড়েদের সংঘাত নিয়ে রূপকথাধর্মী এই বইটির সব ছবিই এঁকেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন। গদ্যের পাশাপাশি কবিতা ও দেহাতিগানের ব্যবহার বইটিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, লুম্বিনী হাসপাতালের তিলজলাস্থিত বাড়িটি দান করেছিলেন রাজশেখর। অর্থ সাহায্যও করেছিলেন; বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

৫

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ বাংলা সন ৪ চৈত্র ১২৮৬, মঙ্গলবার রাজশেখরের জন্ম হয়। জন্মস্থান : বর্ধমান শক্তিগড়ের সন্নিকটে বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে।

রাজশেখরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শশিশেখর তাঁর নামকরণ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'দ্বারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর [রাজশেখরের পিতা] বললেন, ফটিকের [রাজশেখরের ডাকনাম] নাম ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, শোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দ্বিতীয় পুত্রের নামও একটা শেখর হবে নাকি? কি শেখর হবে? আমি বললাম, ইওর হাইনেস যখন তাকে আশীর্বাদ করছেন তখন আপনিই তার শিরোমাল্য — আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম 'রাজশেখর'।'[১১]

রাজশেখরের বাল্যকাল কেটেছে মুঙ্গেরের খরকপুরে ও দ্বারভাঙ্গায়। শশিশেখর প্রথম জায়গাটি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ভাগলপুর অপ-এ বরি-আর-পুর স্টেশন। সেখানে থেকে ১২ মাইল দূরে 'খরকপুর' এস্টেট। সেখানে পাহাড়ের কাছে আমি ছেলেবেলায় ৬-১৩ বছর বয়সে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে বাস করেছি।'[১২]

শশিশেখর বসুকে দিয়ে পরিমল গোস্বামী রাজশেখরের বাল্যকথা লিখিয়ে নিয়েছিলেন এবং 'যুগান্তর'-এ (শারদীয় ১৩৬০) ছাপিয়েছিলেন। এটা না করলে তাঁর শৈশব কথা অজ্ঞাতই থেকে যেত। শশিশেখর লিখছেন, 'মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, এক ঘন্টার মধ্যে রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেখতো ভেতরে কি আছে, — কেন বাজে? — কেন ঘোরে?'

বই বইয়ের ঠিকানা

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলস্টপ দিতে শিখল। দুজন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকত আর পায়জামা চায়নাকোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিতো। এই তার হাতে খড়ি। পকেটে অটোমেটিক পেনসিল, হাতে লোহার স্ট্র্যাপ, কখনও বা কাঠের 'সোঁটা'।'

রাজশেখর দৌহিত্রী-পুত্র দীপঙ্কর বসু লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে বাঙলা ভাষার কর্ণধার শৈশবে কয়েকবছর পর্যন্ত বাঙলা বলতে পারতেন না। হিন্দী বলতেন। 'ম্যায় দুধ নেহী পিউঙ্গা' — এই পর্যন্ত সব শিশুর সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য কিন্তু তার পরই বায়না 'হাতীর তলায় বসে দুধ খাব' (অবশ্য হাতীর নয়, বাটি থেকে!)। শেষে দ্বারভাঙ্গা-রাজের হাতীর তলায় বসিয়ে দুধ খাওয়ানো হত (ওঁর নিজের মুখে শোনা)![১৩]

রাজশেখর দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ খ্রি. পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনো করেন। এই স্কুল থেকে তাঁর প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস। তখন তার বয়স চোদ্দ বছর ন মাস। সে বছর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রাজশেখর ছিলেন একমাত্র বাঙালি।

রাজশেখর ফার্স্ট আর্টস বা এফ. এ. পড়েছিলেন পাটনা কলেজে। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্র প্রসাদ, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের অগ্রজ। পাটনা কলেজে যে স্বল্প-সংখ্যক বাঙালি ছাত্র ছিল, তাদেরই একাংশের সঙ্গে রাজশেখর সাহিত্যালোচনা করতেন। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহের শুরু এই সময় থেকে। এই কলেজ থেকেই ১৮৯৭খ্রিস্টাব্দে রাজশেখর দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাস করেন।

মিতভাষী রাজশেখর নিজের ছেলেবেলা সম্পর্কে সরাসরি কিছু লেখেননি; কিন্তু তাঁর কিছু গল্পে (' প্রাচীনকথা', 'চিরঞ্জীব', 'অগস্ত্যদ্বার' 'আতার পায়েস', 'দাঁড়কাক', 'ধনু মামার হাসি' — ইত্যাদি) বাল্য ও কৈশোরের নানা অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে বলে মনে হয় :

(ক) 'হালদার খুশী হয়ে বললেন, তবে বলি শোন। মুঙ্গের জেলার খরকপুরে থাকতে দু-বেলায় একটি আস্ত পাঁঠা সাবাড় করতুম। চার আনায় একটি নধর বকড়ি, আবার তার চামড়া বেচলে পুরোপুরি চার আনাই ফিরে আসত।' ('চিরঞ্জীব')

(খ) 'পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পাটনায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি ছিল। শহরের গুলজারবাগ মহল্লা থেকে বাঁকিপুর জজ-আদালত পর্যন্ত সিংগল লাইনে গাড়ি চলত।' ('অগস্ত্যদ্বার')

(গ) 'স্থান' — উত্তর বিহারের একটি ছোট শহর।

কাল - প্রায় সত্তর বৎসর আগে। বেলা তিনটে, আমাদের মিড্‌ল ইংলিশ অর্থাৎ মাইনর স্কুলে থার্ড ক্লাসে পাটীগণিত পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসের ছেলেরা উসখুশ ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাস্টার বললেন, কি হয়েছে রে?

তখন শিক্ষককে সার বলা রীতি ছিল না, মাস্টার মশাই বলা হত। আমাদের মুখপাত্র কেষ্ট বলল, এইবার ছুটির দিন মাস্টার মশাই, সবাই চাদরাবাগ যাব।

— সেখানে কি জন্যে যাবি?

— কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাঁর দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেড মাস্টারমশাই ছুটি দিন।' ("বনোয়ারীবাবু", 'প্রাচীন কথা')

(ঘ) 'তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, পলিটিক্স নিয়ে বেশী লোকে মাথা ঘামাত না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের চাইতে মাদাম ব্লাভাৎস্কি শশধর তর্কচূড়ামণি আর পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।' ("সত্যবতী ভৈরবী", 'প্রাচীন কথা')

(ঙ) 'ভোলানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের সর্দার। তার বয়স সকলের চাইতে বেশী, পরপর তিন বৎসর ফেল করে ক্লাস নাইনে স্থায়ী হয়ে আছে। তার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল।

আমাদের শহরটা বড় নয়, মোটে একটা সিনেমা। মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ হত, পুজোর সময় থিয়েটার হত, পুজো হত জাঁকিয়ে। এসব ছাড়া আমাদের ফূর্তির অন্য উপায় ছিল না। একদিন হেডমাস্টার বললেন, কাল শনিবার ছুটির পর তোরা থাকবি, স্বামী ব্যোমপ্রকাশজী এসেছেন, তাঁর লেকচার শুনবি।

নীরস হিন্দী বক্তৃতা শোনাবার আগ্রহ আমাদের ছিল না, কিন্তু খোলা মাঠে দল বেঁধে বসাতেও একটা মজা আছে।' ('ধনুমামার হাসি')

৬

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ পাস করলেন রাজশেখর। এর পর কলকাতায় পাড়ি। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। দুটি বিষয়ে অনার্স নিলেন পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাস। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠস্থান অধিকার করেছিলেন। এই বছর ওই দুটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন শরৎকুমার দত্ত। শরৎকুমার দত্ত পরে জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যৌথভাবে বিখ্যাত 'অ্যাডেয়ার ডাট' কোম্পানির সূচনা করেন। তাঁর আজীবন বন্ধু, পরবর্তীকালে 'সচিত্র ভারত' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও এই সময়ের ছাত্র, তবে কলাবিভাগের। তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী (রসায়ন বিভাগের ডিমনেস্ট্রেটর), কালীপদ বসু প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন রাজশেখর। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসাবে রসায়নে এম. এ পাস করলেন দ্বিতীয়

বই বইয়ের ঠিকানা

শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। সে বছর রসায়নে কেউই প্রথম শ্রেণী পায়নি। ১৯০২-এ তিনি বি. এল. পাস করলেন, কিন্তু আইনজীবীর জীবিকা তাঁর পছন্দ হল না।

রাজশেখর মনোমত বিষয় নিয়েই পড়াশুনা করেছিলেন, পরে মনোমত কর্মক্ষেত্রও পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর আগ্রহ একেবারে ছেলেবেলা থেকে, বিশেষত রসায়নে। এই অজ্ঞাত দিকটির বিবরণ দিয়েছেন তাঁর অগ্রজ শশিশেখর : 'সায়েন্স পাস করবার আগেই ল্যাবরেটরী হল, দুই আলমারী এসিড, ক্লোরেট অব্ পটাশ, কোবাল্ট, ক্লোরাইড ইত্যাদি। বোমা তৈরী করে ফাটাত, কাগজের ব্যারোমিটার তৈরী করে দেয়ালে এঁটে বলতো বৃষ্টি হবে কিনা, আমাদের কাশি হলে কফ মিকশ্চার প্রেসক্রিপশন লিখতো, কবিরাজি কেতাব আমি এনে দিতাম তাই পড়তো।' ('রাজশেখরের ছেলেবেলা' শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬০)

আইনজীবী না হলেও, আইন-জ্ঞান তাঁর কাজে এসেছিল, কী-গল্প রচনায় কী বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিচালনায়।

রাজশেখর যে বছর বি. এ. পাস করেন, সেই বছরই তাঁর বিবাহ হয়। পাত্রী কলেজস্ট্রিট পাড়ার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী মৃণালিনী (১৮৮৬-১৯৪২)। মৃণালিনীর পিতা যোগেশচন্দ্র ছিলেন উকিল। তাঁর বাড়ি ছিল সংস্কৃত কলেজের ঠিক বিপরীতে। এঁদের বাড়ির বৈঠকখানায় একসময়ে বিখ্যাত মানুষেরা এসেছেন, গল্পগুজব করেছেন। শোনা যায় বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। পরবর্তীকালে স্যার আশুতোষ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ — এঁরা আসতেন।

মৃণালিনী সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'তে লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী একসময়ে লিখেছিলেন : 'বসুজায়াকে [মৃণালিনী] আমি কিছুক্ষণের জন্য জয়পুরে দেখেছিলাম এবং বসু মহাশয়কে দেখেছিলাম আহারের সময়। সেকালে আমাদের বাইরে বেরিয়ে আলাপের প্রথা ছিল না। বসুপত্নীকে যেটুকু দেখেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল তিনি আনন্দময়ী। আকস্মিক বিপুল খ্যাতি এবং তখন সুখদুঃখহীন পারিবারিক জীবন আনন্দের কানায় কানায় ভরে রেখেছিল তাঁর জীবনকে।'[১৪]

মৃণালিনী সুগৃহিণী ছিলেন, কিন্তু বৈশিষ্ট্যে রাজশেখরের বিপরীত। রাজশেখর সর্বদা শান্ত, অতিস্বল্পভাষী। মৃণালিনী প্রাণোচ্ছলা, জীবনীশক্তিতে ভরপুর। কিন্তু তাঁদের একমাত্র কন্যা প্রতিমা পেয়েছিলেন পিতার স্বভাব। প্রতিমাও ছিলেন স্বল্পভাষী।[১৫]

দাম্পত্য প্রেমকে রাজশেখর কী চোখে দেখতেন 'বরনারীবরণ' গল্পটি পড়লে তা বোঝা যায়। গল্পটিতে আছে রিটায়ার্ড এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাখহরিবাবু বরনারী প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠতমা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন নিজের পত্নী বৃদ্ধা থাকমনি দেবীকে। দাম্পত্যজীবনে সুখী কোনো মানুষের পক্ষেই এ গল্প লেখা সম্ভব।

৭

বেঙ্গল কেমিক্যালের জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। রসায়নশাস্ত্রের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনীষী-অধ্যাপকের সারাজীবনে স্বপ্ন ছিল ব্যবসায়-বিমুখ বাঙালির স্বনির্ভরতা শিক্ষা। তাঁর 'আত্মচরিত'-এর একাংশে আছে, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড বাংলার একটি শক্তিশালী নব্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ডা: প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি.এস.সি, এফ.সি, ১৫ বৎসর পূর্বে আপার সার্কুলার রোডের একটি গৃহে ব্যক্তিগত ব্যবসায়রূপে ইহা আরম্ভ করেন এবং দেশীয় উপাদান হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে থাকেন। ছয় বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ টাকার মূলধনসহ লিমিটেড কোম্পানিতে ইহা পরিণত হয়। কলিকাতার বহু বড় বড় রাসায়নিক ইহার অংশীদার। বর্তমানে ৯০, মানিকতলা মেন রোডে এই কোম্পানির সুপরিচালিত বৃহৎ কারখানা আছে। সেখানে প্রায় ৭০ জন শ্রমিক কার্য করে। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ.।[১৬]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই কোম্পানিতে রাজশেখরের যোগদান : 'প্রসিদ্ধ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজ কেমিস্ট্রি বিভাগে রাজশেখরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্যতম কর্তা। কোনও নিরুদ্বিগ্ন শান্তি পূর্ণ কাজে নিয়োজিত হইবার জন্য রাজশেখর ভাদুড়ী-মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতেই তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল কেমিক্যালের কেমিস্টের পদে বহাল করিয়া দেন।'[১৭]

বি.এল. পাস করলেও ওকালতি তাঁর মনঃপূত হয়নি। ফলে 'মাত্র তিনদিন কোর্ট যাত্রা, সেখানে থেকে পলায়ন।'[১৮] এখানে মনোমত ক্ষেত্র পেলেন। ফলে, কৃতিত্ব দেখিয়ে যোগদানের পরের বছরই (১৯০৪) কর্মসচিব বা ম্যানেজার।

রসায়ন এবং ব্যবসায় পরিচালনা, দুদিকেই রাজশেখরের দক্ষতা ছিল। এই যুগপৎ অধিকার না থাকলে বেঙ্গল কেমিক্যাল সেকালের সেরা রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান হতে পারত না। স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও এ কথা স্বীকার করতেন, '...রাজশেখর ও তাঁর সঙ্গীরা থাকলে ওরকম বেঙ্গল কেমিক্যাল আরও ২/৩টি তৈরি করতে পারবো।'[১৯]

রাজশেখর যখন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, তখন এর কর্মী-সংখ্যা একশ'র নিচে। ৩০ বছর পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন অবসর নিচ্ছেন তখন কর্মীসংখ্যা দুহাজারেরও বেশি। রাজশেখরের পরিচালনায় বেঙ্গল কেমিক্যালের যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, নিচের পরিসংখ্যান থেকে তা আন্দাজ করা যাবে।

১৯০১ : মোট বিক্রির পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা

১৯০৫ : মানিকতলায় দশ বিঘা জমি কেনা। উৎপাদন-বিভাগ স্থানান্তর।

১৯০৭-১৯০৯ : সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্টের কাজ শুরু।

১৯১০ : রাসায়নিক পদার্থ, ঔষধ ইত্যাদি ছাড়াও, সার্জিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও প্রসাধনীদ্রব্য তৈরি শুরু হল। বাৎসরিক বিক্রির পরিমাণ লক্ষ টাকা।

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯১৪ : বাৎসরিক বিক্রি পাঁচ লক্ষাধিক টাকার।

১৯১৯-২১ : পানিহাটিতে ১৩৫ বিঘা জমি সংগ্রহ ও নতুন কারখানার কাজ শুরু।

১৯২৬ : বাৎসরিক বিক্রি ২৫ লক্ষ টাকার ওপর।

১৯৩০ : কর্মীসংখ্যা দুহাজারেরও বেশি। নিট লাভ ৫০ লক্ষের কাছাকাছি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের বহু উৎপাদনই রাজশেখর পরিকল্পিত। অধিকাংশের নামকরণও তাঁর। তৎসম তদ্ভব বা বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে প্রস্তুত দ্রব্যের নামকরণ করতেন। নামকরণের মধ্যে পদার্থটির প্রকৃতি ও গুণাগুণ ধরা পড়ত, মনে রাখতেও সুবিধে হত। ক্রেতা-আকর্ষণের এই কৌশল এখন সর্বত্রই চলে। যেমন —

মারকিট = কীটনাশক পদার্থ

কনসেন্ট = সুগন্ধ-সার, এসেন্স

ডায়াবিনল = ডায়াবেটিসের ওষুধ

কাসাবিন = কাশির ওষুধ

কোয়াটিন = স্নায়ুস্নিগ্ধকারী ওষুধ

আইডোলেপ = আইওডিন প্রলেপ বা মলম

বোরোলেপ = বোরিক মলম

এরকম অসংখ্য ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য, প্রসাধনীদ্রব্য নামের গুণে কাজের গুণে জনপ্রিয় ছিল। এগুলি পত্রিকার পাতায় যখন বিজ্ঞাপন রূপে যেত, তখন বিজ্ঞাপনের বয়ান তিনিই লিখতেন। বিজ্ঞাপনের ছবি তাঁর নির্দেশ মতো যতীন্দ্রকুমার সেন প্রমুখ কর্মী-আর্টিস্ট আঁকতেন। কৃতী বিজ্ঞানী এ ক্ষেত্রে কৃতী বিজ্ঞাপনস্রষ্টাও।

অফিসের খাতায় ও কাগজপত্রে বাংলায় সই করতেন। বহু কাজে বাংলা ব্যবহার হত। যেমন ডেসপ্যাচ স্লিপ = যা-পত্র ; ভিজিটিং অর্ডার স্লিপ = দ্র. পত্র— ইত্যাদি।

প্রায় সমস্ত কর্মীই তাঁকে সমীহ করে চলত। এর মূলে ছিল তাঁর দক্ষতা, নিখুঁত সময়নিষ্ঠা ও সজাগ দৃষ্টি। কর্মীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর খুব কাছে এসেছেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন তাঁদের এই সর্বময় কর্তা সাধারণমাপের মানুষ নন। বেঙ্গল কেমিক্যালের এক সময়ের কর্মী যশেন্দ্রকিশোর গুপ্ত জানিয়েছেন, 'কাজের তাগিদে অনেকবার বকুলবাগানের বাড়ীতে গেছি। সকালে ছাড়া সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। একটা নোটিশ ঝুলতো 'সকাল ১০টার পর সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ।' কাজের জন্য গেলে সব সময়ই দেখা করতেন...।'

'চিঠির প্রতিটি খাম সযত্নে খুলতেন আর সেটা থেকেই নূতন খাম নিজেই তৈরী করতেন। টেবিল থেকে কোন জিনিস স্থানচ্যুত হত না। পেন্সিলগুলো সব সরু করা

থাকতো। পেন্সিলের ১ ইঞ্চি থাকা পর্য্যন্ত তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন। একদিন ঐ পেন্সিল ফেলে দিয়ে নূতন একটা ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছিলাম। 'ওটা অপচয় হবে', উনি বল্লেন, 'ছোটটা এখনও চলছে, আমার এখনও অসুবিধা হচ্ছেনা, মিতব্যয়ী হবে ; কিন্তু কিপটে হবে না ; তবে তোমাকে দরাজ হতে হবে। Perfumery কেমিষ্ট দরাজ হবে, অপচয় করবে না তবে সুফল পাবে।' সেদিন তাঁকে আমি কৃপণ স্বভাবের লোক ভেবেছিলাম। কিন্তু সেই লোক যখন সরকারী সম্মান পুরস্কারের ৫০০০ টাকা দান করেছিলেন, তখন ভুল ভেঙ্গে গেল।'[২০]

একবার একজন বিদেশি কোম্পানির প্রতিনিধি স্নো-র মূল উপাদান বিক্রি করতে অফিসে রাজশেখরের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজশেখর কাগজের একটি শলাকা তৈরি করে শিশির ভেতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে শুঁকে ও হাতে মাখিয়ে তার পরীক্ষা করলেন। বিস্মিত ও অভিভূত বিদেশি জানালেন, ভারতে যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই সম্ভাব্য ক্রেতা শিশির মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে নমুনা বার করেছেন। কিন্তু এই প্রথম এমন একজনকে দেখলেন, যিনি নোংরা না করে ক্রিম বার করার কায়দা জানেন।

উঁচুমানের সুগন্ধি তৈরি বা অনুরূপ পদার্থ তৈরি করার জন্য তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। একে বলে ফিজিওলজির পদ্ধতি। সম্ভবত তার আগে এ দেশে এর চল ছিল না, অনেকেই এটা জানতেন না, পরেও এর প্রয়োগ খুব কম হয়েছে বলেই মনে হয়। এই পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়কেতু বসু একজায়গায় লিখেছেন, 'কি করে বেঙ্গল কেমিক্যালের সুগন্ধী এসেন্স তৈরী করেছিলেন তার বিস্ময়কর আবিষ্কার প্রণালী শুনে বুঝেছিলাম আমদানী করা দামী যন্ত্রপাতি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব...।' 'তিনি নিজের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহু বিদেশী এসেন্সের গুণগত বিশ্লেষণ করে তাদের মৌলিক উপাদানগুলি নির্ণয় করতেন। পদ্ধতিটা শরীরবৃত্তের কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক আঘ্রাণে মোটামুটি কি কি উপাদানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, সেটি বের করার পর ঐ সমস্ত উপাদানের বিশুদ্ধ নমুনা আলাদা আলাদা শিশিতে রাখতেন। তারপর একটা একটা করে নমুনা 'ধরে সেটি বারবার আঘ্রাণ নিতে থাকতেন, যতক্ষণ না ক্লান্তির ফলে সেই বিশেষ ঘ্রাণটির বোধশক্তি লুপ্ত হয়। ক্লান্তি অর্থাৎ fatigue এর পরে মূল বিদেশী এসেন্সটি আবার শুঁকতেন, তখন একটা নতুন গন্ধের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। যার অস্তিত্ব আগে বোঝা যায় নি। এইভাবে ধৈর্য, পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে এক এক করে বিদেশী উচ্চমানের সুগন্ধী এসেন্সের সব উপাদানের গুণগত বিশ্লেষণ অর্থাৎ Qualitative analysis করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর গবেষণাগুলি তিনি প্রবন্ধ আকারে লিখে রাখেন নি। থাকলে রস-সাহিত্যের চেয়ে সেগুলি কম মূল্যবান হত না।'[২১]

বই বইয়ের ঠিকানা

বেঙ্গল কেমিক্যালের যে বিশাল টেকনিক্যাল লাইব্রেরি ছিল, তার সব বই রাজশেখরের পড়া ছিল।

তিরিশ বছর চাকরি করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি অবসর নেন। অবসর নিলেও বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস-এর একজন এবং কোম্পানির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার রূপে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন রাজশেখর।

৮

একটি আড্ডা বা আসরের সঙ্গে পরশুরামের নাম জড়িয়ে আছে, সেটি 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। আগে নাম ছিল ক্যালকাটা আরবিট্রারি ক্লাব পরে উৎকেন্দ্র সমিতি। অনেকের মতে বাংলা নাম রাজশেখরের, কিন্তু গোপাল হালদারের মতে 'শ্রীনারদ' ছদ্মনামে পরশুরামের গল্পে যিনি ছবি আঁকতেন, সেই বিখ্যাত আর্টিস্ট ও কার্টুনিস্ট যতীন্দ্রকুমার সেনের।

'বিচিত্রা' আসরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, 'মানডে ক্লাব'-এর সঙ্গে সুকুমার রায়ের নাম যেমন জড়িয়ে আছে, 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র সঙ্গে জড়িয়ে গেছে রাজশেখরের নাম। যদিও তিনি এ আড্ডার পত্তন করেননি, বা উৎসাহী সভ্যও নন। আড্ডায় উপস্থিত হতেন কম, কথা বলতেন আরও কম।

কিন্তু পরশুরামের লেখার সঙ্গে এই আড্ডা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। বিচিত্রা, মানডে ক্লাব, 'ভারতী'র আড্ডা, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা — এসব জায়গায় নিছক আড্ডার সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চলত। প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলে লোকে যেমন মন হাল্কা করত, অনেকে লেখার রসদ ও প্রেরণা সংগ্রহ করতেন এখান থেকে। গিরীন্দ্রশেখর তাঁর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক লেখা এখানে পড়ে শোনাতেন। রাজশেখরের 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এই আসরেই প্রথম পড়া হয়। চমৎকৃত সভ্যগণের প্রবল চাপে ও নিয়মিত আড্ডাধারী জলধর সেনের কৌশলে রাজশেখর গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছদ্মনামে ছাপতে বাধ্য হন।

রাজশেখরের বহু গল্পের চরিত্র, তাদের হাবভাব — উৎকেন্দ্র থেকেই সংগৃহীত। 'বংশলোচন বাবুর বাড়ির আড্ডা', 'বিরিঞ্চিবাবা' ও 'চিকিৎসা সংকট' গল্পে আড্ডার ছবি — এ সব ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে উৎকেন্দ্র সমিতির প্রভাব আছে। 'বিরিঞ্চিবাবা'র ১৪ নম্বর পার্শিবাগানের আড্ডা হয়ে গেছে ১৪ নম্বর হাবসীবাগান।

এই আড্ডা থেকে নানা চরিত্র উপাদান সংগ্রহ করলেও রাজশেখর তাদের এমন ভাবে বদলে দিতেন — কোন আড্ডাধারী বা পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র গল্পে এসেছে তা ধরা মুশকিল। 'প্রবাসী'র সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় আড্ডায় আসতেন। রাজশেখর তাঁকে জানিয়েছিলেন — গল্পে আপনার নামটি নিচ্ছি।[২২] কিন্তু শুধু নামটি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু 'লম্বকর্ণ', 'দক্ষিণরায়' ইত্যাদি গল্পের তামাকসেবী অনিয়মিত ক্ষৌরকর্মে

অভ্যস্ত, আজগুবি গল্প বলতে ওস্তাদ, পৈতাধারী সদ্‌ব্রাহ্মণ 'কেদার চাটুজ্যে'র সঙ্গে অতি সুদর্শন ও ধোপদুরস্ত পোশাক পরা 'প্রবাসী' সম্পাদকের নাম ছাড়া আর কিছুই মিল পাওয়া যাবে না।

১৯২৮ সালে উৎকেন্দ্র সভার সভ্যরা পরশুরামের 'চিকিৎসাসংকট' গল্পটি নাটকরূপে মঞ্চস্থ করে। প্রথমবার রামমোহন লাইব্রেরি হলে, দ্বিতীয়বার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। উদ্যোক্তা এবং পরিচালক ছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, মহড়া — সবেরই দায়িত্বে ছিলেন তিনি।[২৩]

এই আড্ডার একজন সভ্য শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 'উৎকেন্দ্র সমিতি'[২৪] নামে প্রবন্ধ লিখে আড্ডার বিবরণ, বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আর লিখেছেন গোপাল হালদার। তাঁর আত্মকথা 'রূপনারায়ণের কূলে' গ্রন্থে '১৪ নম্বর' বলে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদই আছে। তাঁর লেখায় এই আড্ডার সময়কাল, স্থান ও আড্ডাধারীদের বিস্তৃত বিবরণ আছে। আছে রাজশেখরের কথাও :

'... পরশুরামের সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই ১৪ নং পার্শিবাগানে 'উৎকেন্দ্রিক ক্লাব' গড়ে উঠেছিল, আমার স্থির বিশ্বাস। অর্থাৎ, অন্ততঃ ১৯১৯-২০-রও বেশ আগে। আর, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন বোধহয় তার কাণ্ডারী।' '১৪ নং-এর ফটক দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় উঠলে — সামনে ডা: বসুর চিকিৎসা-গৃহ, ডাইনে যাবার সিঁড়ি। বামে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ঘর — জোড়া তক্তপোসের ওপর শতরঞ্জি, শাদা চাদর বিছানো দেশী ফরাস।' '১৪ নং-এর সেই বৈঠকখানায় দুপুরের পর থেকে অপরাহ্নের দিকে যেমন খুশী আসবেন 'ভারতবর্ষ' আপিসে যাবার পূর্বে সম্পাদক জলধর সেন। আরও একটু পরে — মধ্যাহ্ন তখন নিস্তেজ — 'বড়দা' শশিশেখরবাবু, পাড়ার দু-একজন শিক্ষিত লোক, 'প্রবাসী'র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, পার্শ্বের বিজ্ঞান কলেজের কোনো অধ্যাপক বা বসুবিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যবয়স্ক গবেষক, বেঙ্গল কেমিক্যালের শহুরে আপিসের ফেরতা তার ম্যানেজার রাজশেখর বসু, রোগী দেখবার অবকাশে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু, তাঁর বন্ধু ডা: সত্য রায়, কিম্বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচটা না বাজতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, মাঝে মধ্যে তাঁদের 'প্রবাসী'র সহকর্মীরা ও সজনী দাস, অশোকবাবু প্রভৃতি...' 'পরশুরামের লেখা সেখানে অনেক সময় প্রথম পঠিত হ'ত, তারপর 'নারদ' (যতীন সেন) চিত্রিত করতেন। পাঠ-কালে বা ছবির শেষে ব্যঙ্গ রসিকতারও অভাব হ'ত না — রাজশেখরবাবু সকৌতুকে শুনতেন, স্বল্পতম কথায় সাড়াও দিতেন।'[২৫]

৯

সমকালে রবীন্দ্রনাথের মতো গুণগ্রাহী আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। কোনো নতুন প্রতিভা তাঁর চোখ এড়াত না। রাজশেখরের সাহিত্য-প্রতিভাও তাঁর চোখে পড়েছিল। শুধু লেখা নয়, আর দশজনের থেকে ব্যক্তি-রাজশেখরের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেয়ে

বই বইয়ের ঠিকানা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অসংকোচে জানিয়েছিলেন, তাঁর রাসায়নিক ছাত্রটি কেমিক্যাল গোল্ড নন, খাঁটি সোনা।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'গড্ডলিকা' বেরোয়। রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি এত মুগ্ধ করে যে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'প্রবাসী'তে (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) বইটির সমালোচনা করেন। এই নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া পর্যন্ত (অবশ্যই কৃত্রিম ও কৌতুকজনক) হয়ে যায়; একটি ছোট পত্রযুদ্ধও হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অভিযোগ করেন 'গড্ডলিকা'র প্রশংসা করে তিনি তাঁর এই দক্ষ কর্মীটির মাথা খাচ্ছেন। স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট যখন প্রশংসা করছেন তখন পরশুরামের বই বিক্রি হাজার থেকে বারো হাজারে দাঁড়াবে, কিন্তু তিনি তাঁর এই চমৎকার কর্মীটিকে হারাবেন।

রবীন্দ্রনাথ পাল্টা অভিযোগ করে বললেন, অনেক চমৎকার সাহিত্য-প্রতিভাকেও প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নাগারে বন্দী করে রেখেছেন।

পত্রযুদ্ধের অন্তরালে এই স্বীকৃতি গল্পকার পরশুরামের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও পরশুরামের ভক্ত ছিলেন। লোককে ডেকে বলতেন, দেখ — এ নিজে হাসে না, কিন্তু অপরকে হাসায়।

যে বছর 'গড্ডলিকা' বেরোল সেই বছর অর্থাৎ ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ করে এই মানুষটিকে দেখতে চাইলেন। তখন তিনি অমল হোমের বাড়িতে অতিথি। রাজশেখর অমল হোমের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে এলেন। তাঁর কেমন লেগেছিল রাজশেখরকে? জোড়াসাঁকোয় ফিরে লেখা একটি চিঠিতে তা ব্যক্ত করেছেন, 'অমল, কাল তোমার ওখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে কথা বলে ভারি খুশি হয়ে এসেচি। ওঁর হাতে কুঠার আছে কিনা জানি না কিন্তু ওর অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবুদ্ধির আবর্জনা। উনি সহজ করে সব জানেন — সহজ করে সব বলতে পারেন। ওকে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসবার ভার রইল তোমার ওপর।'[২৬]

রাজশেখরও নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তবে ২১ বছর পর। সংক্ষেপে, নিরাবেগ ভঙ্গিতে — যা তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। অথচ শ্রদ্ধার অভাব নেই তাঁর লেখায় : 'প্রায় একুশ বছর আগেকার কথা। অমল হোম মহাশয় বলে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ আসবেন, আমাকে দেখতে চান। ভয় হল, কারণ আমি একটা দেখবার মতন মানুষ নই, বয়স হলেও অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে লাজুক, কুনো আর অসামাজিক বলেও আমার বদনাম আছে। ...কবি কি মনে করেছিলেন জানি না। কিন্তু আমি নিরাশ হই নি। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ একমুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর কাছে ঘোমটাবতী পল্লীবধূর জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধীরে ধীরে এই মিতভাষী কর্মযোগীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। 'চলন্তিকা'র প্রথম মুদ্রণ পেয়ে তিনি রাজশেখরকে 'আপনি' সম্বোধন করে চিঠি লিখেছেন। কয়েক বছর বাদে নতুন সংস্করণ পেয়ে 'তুমি' সম্বোধন করে চিঠি দিলেন : 'বাংলা

ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে যে ইচ্ছা করবে তোমার বই ছাড়া তার গতি নেই।' (চিঠির তারিখ ২৮। ২। ১৯৩৯)

রাজশেখর রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে 'শ্রীচরণকমলেষু' বলে সম্বোধন করেছেন। বরাবরই। তাঁর যে-সব চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে এ সম্বোধন আর কারও প্রতি নেই।

কলকাতায় বক্তৃতা সভাসমিতি থাকলে রবীন্দ্রনাথ রাজশেখরের উপস্থিতি কামনা করতেন। নিমন্ত্রণের চিঠি কেউ পৌঁছে দিয়ে আসত।

রাজশেখরের বাড়িতেও তিনি এসেছেন। এই নিয়ে একটি মজার গল্প আছে। কিছুকাল আগে (২১.৩.৯৯) বকুলবাগান রোডের নাম বদলে 'রাজশেখর বসু সরণি' করা হয়। সেইদিনকার অনুষ্ঠানে প্রমাতামহের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে দীপংকর বসু এই গল্পটি শুনিয়েছেন : 'একদিন দুপুরবেলা [রাজশেখর] ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ দাড়িওলা এক ভদ্রলোক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বাড়ির কাজের লোক জানালেন যে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ডাকা যাবে না। অগত্যা ভদ্রলোক বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গেই একঘন্টা গল্প করে ফিরে গেলেন। অতিথি ভদ্রলোক আর কেউ নন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঘুম থেকে উঠে দাদুর যে কী রাগ কেন তাঁকে ডাকা হয়নি' ('কলকাতার কড়চা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.৩.৯৯)

একসময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের শিল্পবিভাগে চাকরির জন্য পুলিনবিহারী সেনের নাম সুপারিশ করে রবীন্দ্রনাথ রাজশেখরকে চিঠিও দিয়েছেন। দেশীয় রঙে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ আছে জেনে দেশীয় ধাতু থেকে নিজে রঙ তৈরি করে পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই রঙ দিয়ে ছবি এঁকে রাজশেখরকে উপহার দিয়েছেন। ১৯৩৬-এ নিজের 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করলেন রাজশেখরকে। বয়সে অনেক বড় হয়েও রাজশেখরকে সম্মান করে উৎসর্গ পত্রে লিখলেন : 'উৎসর্গ / শ্রীরাজশেখর বসু — বন্ধুবরেষু', সেই সঙ্গে ভূমিকা স্বরূপ একটি কবিতা।

রাজশেখর রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একাধিকবার শান্তিনিকেতনে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সস্ত্রীক দেখাও করেছেন। দীপংকর বসু জানিয়েছেন : একবার পত্নীসহ রাজশেখর রবীন্দ্রনাথের সমীপে। রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ প্রশ্রয়ে মৃণালিনী অকাজের গল্পে মেতে উঠলেন। রাজশেখর চিন্তিত, নিশ্চুপ। কিন্তু অকাজের গল্পে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীকেও ছাপিয়ে গেলেন।

রাজশেখর কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা বা সাহচর্যে কখনও অভিভূত হননি বা স্বাতন্ত্র্য হারাননি। তাঁর লেখা, ভাষা, ভঙ্গি, জীবনযাপন, দৃষ্টিভঙ্গি সবই রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র। সেকালে প্রখর রবিরশ্মি থেকে অনেকেই নিজেকে বাঁচাতে পারেননি, রাজশেখর পেরেছিলেন।

রাজশেখরকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কেমিক্যাল গোল্ড নন, খাঁটি খনিজ সোনা'। আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রাজশেখরের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'প্রথম পরিচয়'

বই বইয়ের ঠিকানা

নামক প্রবন্ধের শেষ বাক্যে : 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা' — এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজের স্বভাবের একদিকের পরিচয় দিয়েছেন।'

১০

বেঙ্গল কেমিক্যালে ৩০ বছর চাকরি করে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কারণে রাজশেখর অবসর নিলেন। অবসর নিলেও পরিচালক-মণ্ডলীর একজন ও পরামর্শদাতা হিসেবে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ থেকেই গেল।

এইসময় তিনি আরও বেশি করে সাহিত্যচর্চা ও নানাধরনের লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করলেন। সৃজনমূলক কাজে ব্যাপৃত রইলেন।

রাজশেখরের জীবনের সবচেয়ে দুঃখবহ ঘটনা ঘটল এইসময়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল একই দিনে তাঁর কন্যা ও জামাতার কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে মৃত্যু ঘটল। পরের দিনের একটি দৈনিক পত্রিকায় এই ঘটনার বিবরণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয় :

স্বামীর আগেই স্ত্রীর মৃত্যু
একজন প্রকৃত 'সতী' নারী
একই চিতায় দম্পতির সৎকার

'আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি অমরনাথ পালিত এম. এসসি, বি.এল. মাত্র ৪৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বিগত রবিবার ৬৬ নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে স্বগৃহে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বরাবর ছাত্র হিসেবে কৃতী অমরনাথ বিদ্যাসাগর কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ পালিতও উক্ত কলেজের একজন অধ্যাপক। পরবর্তীকালে অমরনাথ ক্যালকাটা সোপওয়ার্কস লিমিটেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। শেষাবধি তিনি আইনজীবীর পেশাকে বেছে নেন এবং প্রচুর সুনাম অর্জন করেন।...

ঘটনাটি আরও শোকাবহ, কারণ তাঁর সাধ্বী স্ত্রী, যিনি কিছুকাল ধরে তাঁর সেবা করে আসছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন তাঁর স্বামীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শেষ চারদিন তিনি জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন নি। একসময়ে স্বামীর রোগশয্যায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন, অনতিবিলম্বে তাঁর মৃত্যু হয়। এর তিনঘণ্টা পরে অমরনাথের মৃত্যু ঘটে। দম্পতিকে নিমতলা শ্মশানঘাটে একই চিতায় দাহ করে হয়।' [অনুবাদ][২৭]

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আত্মকথা 'ফিরে ফিরে চাই' গ্রন্থে অমর পালিতের প্রসঙ্গ আছে। প্রভাতকুমার লিখছেন, 'রসায়ন বিভাগের তরুণ অধ্যাপক, বোধহয় নাম অমর পালিত ও তাঁর এক বন্ধু বোধহয় শরৎ ঘোষ — মেট্রোপলিটান

কলেজের অধ্যাপক — এঁরা 'নির্মলিন' নামে কাপড়কাচা সাবান বের করে খুবই সুনাম অর্জন করেন — সানলাইটের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে।...আজ 'নির্মলিন'-এর কথা লোকে ভুলে গেছে। মনে আছে অমর পালিতের অকালমৃত্যু ও নানা আর্থিক অভাবহেতু 'নির্মলিন'-এর কারখানা বন্ধ হয়ে লিকুইডেটরদের হাতে যায়।'[২৮]

অমর পালিত সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। দুর্ভাগ্য, তাঁর বলিষ্ঠ শরীরে বাসা বেঁধেছিল ক্ষয়রোগ। ফলে ৪৪ বছর বয়সেই তাঁর অন্তিম পরিণতি ঘনিয়ে আসে। অমরনাথ ও প্রতিমার সন্তান বলতে একপুত্র ও এককন্যা। পুত্রটি জন্ম থেকেই বোধশক্তিহীন। কন্যা 'আশা'কে মানুষ করেছিলেন ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন রাজশেখর। আশার সঙ্গে প্রতীপকুমার বসুর বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র পুত্র দীপংকর।

অন্তরে সুগভীর আঘাত পেলেও, স্থিতধী রাজশেখর বাইরে ছিলেন অচঞ্চল। বকুলবাগানের বাড়ির দোতলায় বারান্দায় যেখানে তিনি বসতেন ও অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলতেন, সেখানের একটি দেওয়ালে শ্বেত-পাথর দিয়ে কন্যার একটি 'রিলিফ' তৈরি করিয়েছিলেন। কন্যা-জামাতার মৃত্যুর পরের দিন তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে ভুল হয়নি আর লিখেছিলেন একটি আশ্চর্য কবিতা 'সতী' :

সতী

নিশিশেষে কৃতান্ত কহিল দ্বার ঠেলি, —
ছাড় পথ হে কল্যাণী, আনিয়াছি রথ,
জীর্ণ দেহ হতে আজি পতিরে তোমার
মুক্তি দিব। ধৈর্য্য ধর, শান্ত কর মন।'
কৌতুকে কহিল সতী — 'দেখি দেখি রথ।'
সসম্ভ্রমে বলে যম — 'দেখ দেখি দেবী
রথশয্যা মাতৃঅঙ্কসম সুকোমল
ব্যথাহীন শান্তিময় বিশ্রাম-নিলয়,
কোনো চিন্তা করিও না হে মমতাময়ী।'
চকিতে উঠিয়া রথে বসে সীমান্তিনী
বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি' কর
বলে যম — 'কি করিলে কি করিলে দেবী!
নামো নামো, এ রথ তোমার তরে নয়।'
দৃপ্তস্বরে বলে সতী — 'চালাও সারথি,

বই বইয়ের ঠিকানা

বিলম্ব না সহে মোর, বেলা বহে যায়।'
বিমূঢ় শমন কহে — 'যথা আজ্ঞা সতী।'
উল্কাসম চলে রথ জ্যোতির্ময় পথে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা দেখে কোটি চক্ষু মেলি'।
প্রবেশি' অমরলোকে জিজ্ঞাসে শমন —
'হে সাবিত্রীসমা, বল আর কি করিব?'
কহে সতী — 'ফিরে যাও আলয়ে আমার,
যার তরে গিয়াছিলে আনো শীঘ্র তারে।'
কৃতান্ত কহিল — 'অয়ি মৃত্যু-বিজয়িনী,
নিমেষে যাইব আর আসিব ফিরিয়া।'

দীপংকর বসু লিখেছেন, 'পরের দিন ভোরে [মৃত্যুর] এই নিয়ে লিখলেন 'সতী' কবিতা ; সদ্যাপিতৃমাতৃহীনা একমাত্র দৌহিত্রী 'আশাকে' (আমার মা) সেটা দিয়ে বললেন স্বল্পতম কথা — 'লেখাপড়া নিয়ে থাক। বিদ্যার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।'

'...এ কবিতার মূল্যায়ন আমার সাধ্যাতীত। তবু বলতে পারি এ কবিতার সৃষ্টির পটভূমি, এর দর্শন ও তারপরের স্বল্পতম উক্তিই রাজশেখরের সারাজীবনের কর্ম ও প্রতিভা ছাপিয়ে ওঠা মূল মন্ত্র।'[২৯]

১১

'ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্পে' 'লক্ষ্মীর বাহন' বলে একটি গল্প আছে। গল্পের মূল চরিত্র মুচুকুন্দ রায়। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ইংরেজ জার্মান মার্কিন প্রভৃতির খ্যাতি শোনা যায় যে তারা সব কাজ নিয়ম অনুসারে করে, কিন্তু মুচুকুন্দ তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। সদ্য অয়েল করা দামী ঘড়ির মতন সুনিয়ন্ত্রিত মসৃণ গতিতে তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পরিহাস করে বলেন, তাঁর কাছে চিকচিক শব্দ শোনা যায়।' স্বয়ং রাজশেখর বসুর ওপরও একই বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা যায়। সমকালে পরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছে তাঁর নিয়মনিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা বিস্ময় জাগাত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'কটা বেজেছে যদি ঘড়ি মেলাতে চাও... রেডিও খুলে প্রোগ্রাম মেলাবার দরকার নেই। ...রাজশেখরকে দেখ। দেখ উনি বাজার গেলেন কিনা। তা না হলে সাতটা। নীচের বৈঠকখানা থেকে ওপরে উঠে গেলেন কিনা। তাহলে নটা। খেতে বসেছেন নাকি? তাহলে ১১টা।'

'ঘড়িতে তিনি নিজেই দম দিতেন। যেদিন তাঁর মেয়ে মারা যায় তার পরদিন ভোরে উঠে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দিতে তাঁর ভুল হয়নি।'

'তাঁর পোশাক-আশাক ছিল নিতান্ত সাধারণ। 'আজীবন হাঁটুর একটু নীচে পরা খেটো ধুতি আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি বা কোট। সব সময়েই পরিচ্ছন্ন, যদিও অল্প বিস্তর ছেঁড়া।'

প্রদৌহিত্র দীপংকর বসু শেষ বয়সে তাঁর সারাদিনের কর্মপদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে 'বহুকাল থেকে তাঁর অভ্যাস ভোর প্রায় সাড়ে চারটেয় উঠে নিজের হাতে চা তৈরী করে খাওয়া...। শরীর খারাপ না থাকলে এরপর একতলায় নাবতেন তাঁর পড়ার ঘরে। এইসময়টা কাটত কাগজ পড়ে ও নানালোকের চিঠির উত্তর দিয়ে। ... বাঙলা খবরের কাগজ খুব খুঁটিয়ে পড়তেন ও এদিকে ওদিকে লুকিয়ে থাকা ছোটখাট অথচ অদ্ভুত খবরগুলোয় রোজ লাল পেন্সিলের দাগ দিতেন।...'

'এরপর ওপরে উঠে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসতেন। এইসময় তিনি কমলালেবু দিয়ে দই খেতেন। মিষ্টি নয়, বাড়ীর পাতা একেবারে টক দই। কমলালেবুও মিষ্টির চেয়ে টকই বেশী পছন্দ ছিল।'...

'এর কিছুক্ষণ পর চান ও খাওয়া। খাওয়ার পর ওপরেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নীচে নামতেন...। তখন বিশেষ কাজ করতেন না। বিকেলে আবার ওপরে উঠে জলখাবার খাওয়া। সাধারণত পাউরুটি বা মুড়ি, চীনেবাদাম, ফল ইত্যাদি খেতেন। নটার কিছু পরে তিনি দুধ ও কোনো কোনোদিন ইশবগুল খেয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে, এসে শুয়ে পড়তেন।' (যষ্টিমধু বৈশাখ ১৩৬৭)

রাজশেখর নিজে ভালো রান্না করতে পারতেন। সাধারণ রান্না তো বটেই, জিলিপির পুডিং বা কুমড়োর স্যান্ডুইচ তাঁর আবিষ্কার। চমৎকার আচার করতে পারতেন। অমিতাভ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা '...বেড়াতে গিয়েছি তখনকার বিখ্যাত আর্টপ্রেস ও 'সচিত্র ভারত' নামক সাপ্তাহিকের মালিক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি রাজশেখরবাবুর বন্ধু। প্রায় যাতায়াত করেন তাঁর বাড়িতে। দেখলাম রাজশেখরবাবুর তৈরি নানারকম আচার বাড়িতে বয়ামে বয়ামে সাজানো। দুএকটা খেলাম। অতি উপাদেয়।' (কোরক / বইমেলা ১৪০১ / অমিতাভ চৌধুরী)

তিনি রান্নার সুবিধার জন্য তরল মশলা তৈরি করেছিলেন। গিরীন্দ্রশেখরের কন্যা তাঁর মানিকতলার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, রান্নার বিভিন্ন মশলা তরলীকৃত করে রাজশেখর শিশিতে সাজিয়ে রেখেছেন। কোন রান্নায় কতটা লাগবে এ সম্বন্ধে তাঁর চমৎকার আন্দাজ ছিল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বারো বছর বয়স থেকে রাজশেখর নিরামিষাশী। তার আগে মাছ মাংস খেয়েছেন, কিন্তু ডিম বা পেঁয়াজ কখনও খাননি। 'আমিষ নিরামিষ'

বই বইয়ের ঠিকানা

('চলচ্চিন্তা') প্রবন্ধে অঘোর দত্তের মুখে হয়তো নিজের কথাই বসিয়েছেন, 'যদি জেরা কর কেন রুচি হয়না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়তো পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে।'

আশ্চর্য শৃঙ্খলায় রাজশেখরের কাজকর্ম হত। সবই তাঁর চলত প্ল্যান অনুযায়ী। কোথাও বেড়াতে গেলে ভৃত্য রেলের কামরায় তাঁর ছক অনুযায়ী জিনিসপত্র সাজিয়ে দিত। ছোট ছোট মেরামতির কাজ মই নিয়ে উঠে নিজেই সেরে নিতেন। চুনকামের সময় নীল ব্যবহার করতে দিতেন না। দরজা জানলার রঙ হত শুকনো পাতার মতো। বকুলবাগানের বাড়িও হয়েছিল তার নিজস্ব প্ল্যান অনুযায়ী।

বই বাঁধাতে পারতেন। কাজের জন্য বহু ফাইলই নিজেই বানিয়ে নিতেন। দাড়ি কামিয়ে ব্লেড রোদে দিতেন। নিজেই নিজের গেঞ্জি ও অন্তর্বাস কেচে নিতেন। নিজের হাতে সেলাই করা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ব্যবহার করতেন। গণনার কাজের সুবিধার জন্য নিজের তৈরি করা অ্যাবাকাস ব্যবহার করতেন। ১৯৩৯-এ পরিভাষা কমিটির সভাপতি। তখন সহকারী সম্পাদক হিসেবে প্রমথনাথ বিশী তাঁর কাজের ধারা লক্ষ করেছিলেন। তিনি আসতেন সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট ও খদ্দরের ধুতি পরে। প্রমথ বিশী লক্ষ করেছিলেন তাঁর কোটে অনেকগুলি পকেট। কোনোটা চশমা রাখার, কোনোটা পেন্সিল ছুরি বা ইরেজার রাখার জন্য।

অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিস তিনি জানতেন — যা একজীবনে একজনের পক্ষে জানা রীতিমতো বিস্ময়কর। প্রদৌহিত্র দীপংকরকে তিনি বলেছিলেন, তিনি Jack of all trade, Master of none কিন্তু পরবর্তী কালে বিশ্বস্ত সচিব দীপংকরের ধারণা Jack of all trades, Master of a few সুরুচি শৃঙ্খলা ও তার সঙ্গে বুদ্ধির আশ্চর্য ব্যবহার দেখে সুনীতিকুমারের দেওয়া, 'সুবুদ্ধিবিলাস' বিশেষণ সার্থক বলে মনে হয়।

১২

আশি বছরের জীবনে রাজশেখর অনেক কিছুই দেখেছিলেন : রাজভক্তি, বঙ্গভঙ্গ, প্রবল ব্রিটিশ বিরোধিতার সূচনা, বঙ্গভঙ্গ রদ, দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তার, দুটি মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা। ১৯৪৭-এর পরে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির যোজন ফারাক সবই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। প্রয়োজনমত গল্পে সে-সব ছবিও ফুটিয়েছেন, কিন্তু সামাজিক গল্পকারের মতো সময়ের বিস্তীর্ণ ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা করেননি। তাঁর গল্পের জাত আলাদা, তাঁর দেখার চোখও স্বতন্ত্র। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ১৯২২-এ মুদ্রিত তাঁর প্রথম গল্প। আর ১৯৫৯-এর শারদীয় আনন্দবাজারে প্রকাশিত 'সাড়ে সাত লাখ' — একরকম শেষ গল্প। হিউমার দিয়ে যাঁর রচনার শুরু, জীবনের

শেষে তাঁর গল্পে দেখা দিয়েছে তীব্র স্যাটায়ার। পরশুরাম এখানে সত্যসত্যই কুঠার তুলে নিয়েছেন।

শুরু ও সমাপ্তির দুই প্রান্তের দুটি ছবি তাঁর গল্প থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে :

'তখন এই কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত, ছেলেরা গোঁফ রাখত, কোটের ওপর উড়ানি ওড়াত, মেয়েরা নোলক পরত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গাইত। গবরমেন্টকে লোকে বলত সদাশয় সরকার বাহাদুর।' ('রাতারাতি', ১৯২৯-৩০ লেখা)

১৯৫৮ তে লেখা 'মাৎস্যন্যায়' (চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প) গল্পের ছবি :

— সংসার চলবে কি করে?

— আপাতত তোমাকে একটা খয়রাতী কাজ জুটিয়ে দেব, দুঃস্থ লোকেদের সাহায্য করতে হবে। বরাদ্দ টাকার সিকিভাগ দান করবে, সিকিভাগ আত্মসাৎ করবে আর বাকি টাকা মাৎস্যসমাজের ফান্ডে জমা দেবে। এ কাজে রিস্ক কিছুই নেই। কালোবাজারি আর ঘুষের দালালিও উত্তম কাজ, তোমাকে তাও জুটিয়ে দেব। তারপর ভেজালওয়ালা আর চোলাইওয়ালাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেব। মনে রেখ সাহস এলে একটু আধটু দোকান লুঠ করবে আর রাহাজানিও অভ্যাস করবে। ...

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিবাকর বলল রাজী আছি, আমাকে মাৎস্যন্যায় সমাজের মেম্বার করে নাও।

১৩

কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবনের অন্তিম বছরে একটি চিঠিতে রাজশেখর লিখেছিলেন, ''উপেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের একটি বাক্য অতি সত্য — বেশীদিন বাঁচতে গেলে বেশী প্রিমিয়াম দিতে হয়। আমার আর প্রিমিয়াম দেবার শক্তি নেই, এখন জীবনধারণ বৃথা।' (৯-৩-৬০)[৩০]

দীর্ঘ জীবনের জন্য রাজশেখরকেও 'বেশি প্রিমিয়াম' দিতে হয়েছে : কন্যা ও জামাতার মৃত্যু, স্ত্রীর মৃত্যু, অনুজ গিরীন্দ্রশেখরের মৃত্যু, অগ্রজ শশিশেখরের মৃত্যু, অগ্রজার মৃত্যু — এ সবই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

কন্যা ও জামাতার মৃত্যু পত্নী মৃণালিনী মেনে নিতে পারেননি। নিরন্তর শোকাতুর অবস্থায় থেকে ১৯৪২-এ তাঁর মৃত্যু হয়। বন্ধু অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতন থেকে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখলে, রাজশেখর উত্তর দিলেন '...মন বলছে নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েকমাস আগে পিছে। যদি এর উল্টো ঘটত তবে তাঁর শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত।'[৩১]

বই বইয়ের ঠিকানা

নাতনি আশা ও নাতজামাই প্রতীপকুমারের সন্তান দীপংকরের জন্ম হয় ১৯ জুন ১৯৪১-এ। সংসারে এই চঞ্চল নবজাতকের আবির্ভাব না হলে, রাজশেখর হয়তো আর বেশিদিন বাঁচতেন না। কিন্তু দুরন্ত প্রাণোচ্ছল প্রদৌহিত্র তাঁকে আরও ১৮ বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল। বাংলা সাহিত্য যেমন লাভবান হয়েছে সেইসঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি অনেক অজ্ঞাত দিক ও অন্য-এক রাজশেখরকে। প্রদৌহিত্র দীপংকরের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা রাজশেখর সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারি: 'রাজশেখর বসু ছিলেন আমার মাতার মাতামহ ; আমি তাকে দাদু বলতাম। আমার দেড় বছর বয়স থেকে বাবা ও মায়ের সঙ্গে তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছি এবং নিরন্তর তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত। এই সান্নিধ্যের ফলে আমার অসামান্য জ্ঞান লাভ হয়েছিল — অতি স্বল্পভাষী রাশভারি এই মানুষ আমার সঙ্গে যত প্রাণ খুলে কথা বলেছেন, নিজের লেখা, মতবাদ ও অন্যের সম্বন্ধে যত আলোচনা করেছেন, জীবনে আর কারুর সঙ্গে তা কখনও করেননি।' 'অবশ্য তাঁর জীবনের একটি গোপনতম খবর তিনি একমাত্র আমার মা শ্রীমতী আশাকেই বলেছিলেন। খবরটি প্রকাশের যখন সময় হয় — ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর — তখন আমি নিতান্তই শিশু। খবরটি মা গতবছর রাজশেখর শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা দূরদর্শন প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত মানিকতলা বোমার ঘটনা — যার হোতা অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা, তার সমস্ত বোমার ফরমুলাই নয়, যাবতীয় মালমশলা দাদুই সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর এই নীরব যোগদান কেউ কোনোদিন জানেনি। ধরা পড়লে অবধারিত সেলুলার জেল — এই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন।' 'রাজশেখর বসুকে সকলেই চিরকাল রাশভারি ও গোমড়ামুখোই দেখেছেন। তাঁর ছেলেমানুষি মজা দেখেছি কেবল আমরাই। দুটি বিষয় উল্লেখ করছি। প্রথমটি বেশ অবিশ্বাস্য। তাঁর নানারকম মিসচিভস বুদ্ধি খেলত। নিজে কখনও কারুর প্রতি তা প্রয়োগ করেননি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যকে এই নষ্টামি-বুদ্ধি দিতেন আর কেউ কারুকে খুব চটিয়েছে বা শুনলে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতেন।' 'বদবুদ্ধি সব সময় না দিলেও মাথায় খেলত কথায় কথায়। সেই টেলিফোনের গল্প। ফোন ধরে 'রং নম্বর' বলে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সামনে অবধারিত আমার কৈফিয়ৎ চাই — কে, কী বলছিল? উনি বললেন — বহুযুগ আগের কথা, কিন্তু প্রতিটি শব্দ হুবহু মনে আছে — 'জিগেস করছে কবিরাজ মশাই আছেন।' একটু থেমে ভাবলেশহীন গম্ভীর মুখে স্বগতোক্তি করলেন, 'বললেই হত হ্যাঁ আমিই কবিরাজ মশাই — খুব দই খাও।'

ব্যাস আর কোনো নির্দেশ নয়, শুধু 'খুব দই খাও।' এই মিসচিফের গভীরতা বুঝতে আমার বহু বছর লেগেছিল, যখন জানলুম কবিরাজি চিকিৎসায় দই বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। বেচারা কবিরাজি-চিকিৎসার রোগীকে তাই খাইয়ে দিচ্ছিলেন।'

'দ্বিতীয় বিষয় — অসামান্য ক্যারিকেচার করার ক্ষমতা ছিল দাদুর। এটি বোধহয় একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি। বিখ্যাত কারুর নয়, আত্মীয়বন্ধু বা প্রতিবেশী কোনো ব্যক্তির কি অপূর্ব নকল করতেন — সে লিখে বোঝাবার নয়। কি হাতনাড়া, বাচনভংগী। কি অপূর্ব মুখচোখের অভিব্যক্তি।' 'দাদুর অবসর সময় কাটত পড়ায় বা হাতের কাজে। কি তালিকা দেবো — বই বাঁধানো, কাগজের শক্ত কৌটো তৈরী, (যার ফিনিস দেখে বিশ্বাস করা শক্ত মেশিনে তৈরী নয়), ছুতোর মিস্ত্রির কাজ? ঘরামির কাজ, ছবি আঁকা engineering drawing, machine-man, লেখার কালি তৈরী, রান্না আচার ... প্রায় ad infinitum."[৩২]

'সুরেশ মজুমদার সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তব রূপায়ণ করলেন বাংলা লাইনো টাইপের। কিন্তু রেন বিহাইন্ড, মূল নকসা রাজশেখরের। এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু একটা 'অনুমান' আছে। রাজশেখর জীবনে কোনো কাজ কারুর 'সহকারী' হিসাবে করেন নি ; অনেক কাজ আদৌ করেন নি, কিন্তু যা করেছেন সম্পূর্ণ ডিকটেটোরিয়াল শক্তি দিয়ে করেছেন।'

'...একদিন নাতজামাই প্রতীপকুমারের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় হঠাৎ বলে বসলেন — 'বাংলা অক্ষর একেবারে তুলে দেয়া উচিত, সব লেখা ছাপা হবে রোমান হরফে।' নাতজামাই, অর্থাৎ আমার বাবা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন — কি বলছেন কি।' গম্ভীর স্বল্পোক্তি 'হ্যাঁঃ বিলক্ষণ।' মনে পড়ে গজেন্দ্রাগ্রজ শুভেন্দু কুমার মিত্রের উক্তি — 'ইংরিজির তুলনায় বাংলায় এত বেশি ছাপার ভুল হবে না, ইংরিজিতে অক্ষরের 'খুপরি' 'শ' খানেকও নয়, বাংলায় খুপরি কয়েক শ।'[৩৩]

রাজশেখরের শরীর ধীরে ধীরে জরা ও ব্যাধির আক্রমণে অশক্ত হয়ে আসছিল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম স্ট্রোক হল। বাজার করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এরপর থেকেই অনেক ব্যাপারে শারীরিক অক্ষমতা এসে গেল। কেউ শতায়ু হওয়ার কামনা জানালেন, বলতেন 'অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকা জীবন্ত নরক ভোগ। আর নয় চটপট চলে যেতে চাই।' সৈয়দ মুজতবা আলী'র চিঠির উত্তরে এবং অন্নদাশঙ্কর ও আরও অনেকের শুভেচ্ছার উত্তরে মৌখিকভাবে একই কথা বলতেন।

তাঁর মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছিল এবার শুধুই অপেক্ষা। পরিকল্পনা ছাড়া যে মানুষটি এক পাও চলেন না, তার অন্তিম মুহূর্তও এল যেন পূর্বনির্দিষ্ট ক্রমে :

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল দুপুর ১২টায় অন্যান্য দিনের ন্যায় মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে দোতলা থেকে একতলায় আসেন বিশ্রাম করার জন্য। অত্যধিক গরমের জন্য ইদানীং তিনি এই সময়টা নীচের তলাতেই কাটাতেন। এখানে বাহিরের কক্ষে পালঙ্কে একটি শয্যা পাতা থাকত, শায়িত অবস্থায় সেখানে তিনি বিশ্রাম করতেন।

দুপুর আড়াইটায় বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ যাবার কথা ছিল। স্থির ছিল বিশ্রাম শেষে সোজা সেখানে যাবেন। একাকী নীচে নেমে এসেছিলেন।

বই বইয়ের ঠিকানা

একাকী শয়ন করেছিলেন বিশ্রাম লাভের আশায়। নীচে এসে তিনি একজন ভৃত্য সুধীর বসুকে বলেন, 'সুধীর, ওসমান (বেঙ্গল কেমিক্যালের গাড়ীর ড্রাইভার) এলেই ওপর থেকে আমার জুতো নিয়ে আসবে আর চটি জুতো জোড়া ওপরে রেখে আসবে।' মৃত্যুর পূর্বে সম্ভবত এ-ই রাজশেখরের মুখের শেষ কথা।

ওসমান এলে সুধীর বসু গিয়ে দেখে বাবু শুয়ে আছেন দুবার ডাকে, সাড়া পায় না। গায়ে হাত দিয়ে দেখে বাবু শক্ত হয়ে শুয়ে আছেন। নিরুপায় হয়ে দিদিমণিকে ডাকে।

দিদিমণি রাজশেখরের নাতনি শ্রীমতী আশা দেবী। তিনি তৎক্ষণাৎ ডা: পি.কে. রায়চৌধুরীকে ডাকেন। দুপুর একটা দশ মিনিটে ডা: চৌধুরী খবর পান ও পাঁচ মিনিটে চলে আসেন। তিনি বুঝতে পারেন যে রাজশেখর আর ইহজগতে নেই।[৩৪]

অসংখ্য অনুরাগীর শোকের পাশাপাশি শান্তিনিকেতন থেকে সৈয়দ মুজতবা আলী দীপংকর বসুকে চিঠিতে লিখলেন : 'হঠাৎ চোখের সামনে একটা বিরাট সমুদ্র শুকিয়ে গেল।' 'আমি পৃথিবীর কোনো সাহিত্য আমার পড়া থেকে বড় একটা বাদ দিই নি। রাজশেখরবাবু যেকোনো সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত। একথা বলার অধিকার আমার আছে।'[৩৫]

জীবনকথা : উৎস-নির্দেশ

১। প্রশান্ত কুমার পাল, 'রবিজীবনী', ভূর্জপত্র, ১৩৮৯, পৃ ৪

২। দীপেন সাহা, 'রাজশেখর বসু', বাগর্থ, ১৯৭২ ও কল্যাণী ঘোষ, 'রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য', ফার্মা কেএলএম, ১৯৮৩ — গ্রন্থদ্বয় থেকে সংগৃহীত। মূল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য।

৩। সৃজননাথ মিত্রমুস্তৌফী, 'উলা বা বীরনগর', কলিকাতা, গ্রন্থকার, বেলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৩৩, পৃ ২১

৪। বিজয়কেতু বসু, 'আমার মেজ জ্যাঠামশাই', 'কোরক', রাজশেখর বসু সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ ৩৪

৫। শতদল গোস্বামী, 'রসিক সাহিত্যিক শশিশেখর বসু', 'দেশ' ২৫ জুন ১৯৮৮ সংখ্যা, পৃ ৬৫-৭০

৬। পরিমল গোস্বামী, 'দ্বিতীয় স্মৃতি', প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রা. লি, ১৯৯৪, পৃ ৮৪, ৮৫

৭। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৫, পৃ ২৯৯

৮। গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের কূলে', দ্বিতীয় খণ্ড, পুথিপত্র, ১৯৮৮, পৃ ২০১

৯। দেবজ্যোতি দাশ, 'গিরীন্দ্রশেখর বসু', সাহিত্যসাধক চরিতমালা — ১০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০২

১০। গোপাল হালদার ... পৃ ২০৭, ২০৮

১১। শশিশেখর বসু, 'রাজশেখরের ছেলেবেলা', শারদীয় যুগান্তর ১৩৬০

১২। শতদল গোস্বামী ... পৃ ৬৯

১৩। দীপংকর বসু, 'অপ্রকাশিত রাজশেখর', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৯৮১, পৃ ১০

১৪। কার্তিক ১৩৪৬ সংখ্যা

১৫। শ্রীদীপংকর বসু জানিয়েছেন।

১৬। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'আত্মচরিত', শৈব্যা সংস্করণ, ১৯৯৮ পৃ ৮৬

১৭। সজনীকান্ত দাস, 'শনিবারের চিঠি', পৌষ ১৩৪৬ সংখ্যা

বই বইয়ের ঠিকানা

১৮। 'অপ্রকাশিত রাজশেখর' ... পৃ ১০
১৯। কল্যাণী ঘোষ ... পৃ ৩৩
২০। কল্যাণী ঘোষ ... পৃ ৩৪
২১। 'আমার মেজ জ্যাঠামশাই' ... পৃ ৩৬, ৩৭
২২। দীপংকর বসু জানিয়েছেন
২৩। গোপাল হালদার ... পৃ ২১০
২৪। 'কথাসাহিত্য', শ্রাবণ ১৩৬০
২৫। গোপাল হালদার ... পৃ ২১১
২৬। 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৬৭
২৭। ১৭.৪.১৯৩৪-এ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের অংশ-বিশেষের অনুবাদ।
২৮। 'ফিরে ফিরে চাই', মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৭৪
২৯। 'পরশুরাম গল্প সমগ্র', ১৯২৯, পৃ ৮২৪
৩০। কল্যাণী ঘোষ ... পৃ ৪১।
৩১। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'স্থিতপ্রজ্ঞ' 'কথাসাহিত্য', শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ৬২৮
৩২। 'অপ্রকাশিত রাজশেখর' ... পৃ ৪-৭
৩৩। 'কোরক' ... পৃ ২৬
৩৪। কল্যাণী ঘোষ ... পৃ ৪৫
৩৫। সৈ. মু. আলী রচনাবলী, একাদশ খণ্ড ... পৃ ৩০৮

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১

রাজশেখর বসুর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ন'টি। গল্প-সংখ্যা একশো'র সামান্য বেশি। তাঁর 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' মাঘ, ১৩২৯ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা হয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প। বসু পরিবারের পৈতৃক বাসভবন ১৪ নম্বর পার্শিবাগানের আড্ডা 'উৎকেন্দ্র সভা'য় রাজশেখর গল্পটি পড়েছিলেন। গল্পটি আড্ডাধারীদের একেবারে মোহিত করে দেয়। 'ভারতবর্ষ'-র সম্পাদক জলধর সেন এই আড্ডায় আসতেন। রাজশেখরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আড্ডাধারীদের চাপে ও জলধর সেনের চেষ্টায় গল্পটি ছাপতে বাধ্য হন। রাজশেখর বা পরশুরাম রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাতারাতি মহীরূহ'।[১]

উৎকেন্দ্র সভায় আসতেন সাহিত্যসেবী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রাণপুরুষ। তিনি সদ্য প্রকাশিত আরও চারটি গল্প নিয়ে ('চিকিৎসা সংকট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ' ও 'ভুশুণ্ডির মাঠে') 'গড্ডলিকা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গল্পগুলির সঙ্গে ছবি আঁকলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন-বিভাগের আর্টিস্ট। তিনিও এক সময়ের দ্বারভাঙ্গার বাসিন্দা, বয়সে ছোট হলেও রাজশেখরের ঘনিষ্ঠ-বন্ধু।

প্রচলিত ধারণা বেশি বয়সেই রাজশেখরের সাহিত্যচর্চার শুরু। 'শনিবারের চিঠি'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭) লেখা হয়েছিল, '১৯২২ খ্রীঃ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এই স্তব্ধ, শান্ত, নিরীহদর্শন বিসুভিয়সের প্রথম অগ্ন্যুৎপাত দৃষ্ট হয়।' ভাষাচার্য সুনীতিকুমার একই কথা বলেছেন, 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু নৈষ্ঠিক সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি পরিণত বয়সেই সাহিত্যরঙ্গে অবতীর্ণ হন।' ('সুবুদ্ধিবিলাস রাজশেখর', 'কথাসাহিত্য', শ্রাবণ, ১৩৬০)

রাজশেখরের বড়দা শশিশেখর কিন্তু অন্য কথা শুনিয়েছেন, 'ছেলেবেলা বা বুড়োবয়সের লেখা ছাপা না হলে কি সেটা সাহিত্য হয় না; 'পুরাণ' 'রামায়ণ' ইত্যাদি পাততাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিল ; ড: সুনীতি চাটুজ্জে মহাশয় বোধহয় তাঁর অপিনিয়ন এবার বদলাতে পারেন, 'রাজশেখর পরিণত বয়সেই সাহিত্যরঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে...।' সাহিত্যরঙ্গ ১৮৯৩ সালেই শুরু হয়েছিল সুনীতিবাবুকে জানাই। বাংলা গল্পলেখার আগে রাজশেখর অন্যান্য ইংরাজী ম্যাগাজিনে লিখত। একটা মনে পড়ে 'দি টিউবওয়েল'। কলম একেবারে ঘুমিয়ে ছিল না। রাজশেখর সাহিত্য সম্রাট হয়েই জন্মেছিল। তা বন্ধ হবার জো নাই।' ('রাজশেখরের ছেলেবেলা' শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬০)

বই বইয়ের ঠিকানা

শশিশেখরের মতই গ্রহণীয়। দীর্ঘদিনের চর্চা, দেখার চোখ, প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা ছিল বলেই তাঁর প্রথম গল্প এত পরিণত। স্বল্পভাষী রাজশেখর নিজের পরিকল্পনা কাউকে জানাতেন না। ফলে তাঁর সাধনার খুঁটিনাটি আমাদের জানা নেই — শশিশেখরের লেখাই এর একমাত্র সাক্ষ্য।

রাজশেখরের গল্পে আছে আশ্চর্য বাঁধুনি। অংশ তো দূরের কথা, কোনো শব্দও বাদ দেওয়া মুশকিল। প্রাচীন গল্পের মতো তাঁর গল্পের আকর্ষণও অমোঘ। একটিও বাড়তি কথা যেমন নেই, তেমনই নিঁখুত তাঁর খুঁটিনাটি বর্ণনা, দেখার চোখ ও তথ্যগত শুদ্ধি। নামী লেখকরাও অনেকসময় তথ্যঘটিত ভুল, সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব ভাষা ও ভঙ্গি দিয়ে ঢেকে রাখেন। রাজশেখরের ভাষার মতো তাঁর তথ্যজ্ঞানও ঝকঝকে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে অসাধারণ নজর। 'গল্প কল্প'-এর অন্তর্গত 'রাজভোগ' গল্প লেখার আগে রন্ধনপটিয়সী নাতনি 'আশা'র কাছ থেকে গল্পে উল্লিখিত কয়েকটি রান্নার রেসিপি যাচাই করে নিয়েছিলেন।[২]

তাঁর নিষ্ঠা, খুঁটিনাটি দেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর প্রদৌহিত্র লিখেছেন, 'অত্যন্ত রাশভারি রাজশেখরের ভাবলেশহীন মুখভঙ্গি ও ততোধিক 'মৃত' চোখের আড়ালে যে চিরন্তন 'হোমসীয়' পর্যবেক্ষণ শক্তি লুকিয়ে ছিল, সেই তাঁর জীবনব্যাপী লোক-চরিত্র প্রকাশের উন্মোচনের উৎস। একমাত্র তাঁর পত্নী মৃণালিনীই তাঁর এই শক্তি সম্বন্ধে বারবার অতি সরল ভাষায় বলেছেন — 'বড় ধড়িবাজ, কার'র (বিশেষতঃ মেয়েদের!) দিকে চোখ তুলে তাকায় না, কিন্তু তাদের হাড়হদ্দ সব জানে।' (গল্পসমগ্র পৃ ৮২৪)[৩]

তাঁর প্রথম বই 'গড্ডলিকা' বেরোলে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে, সেকালের অনেক রথী-মহারথীরা তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শিষ্যের বই পড়ে লিখলেন, 'এই বুড়া বয়সে তোমার গল্প পড়িয়া হাসিতে হাসিতে choked হইয়াছি।'[৪] (কল্যাণী ৯৭ পৃ)

যতীন সেনের ইলাসট্রেশন গল্পগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুকুমার রায়ের লেখা ও ছবি, এডওয়ার্ড লিয়ারের উদ্ভট কবিতা ও উদ্ভট ছবি বা লুইস ক্যারলের 'অ্যালিস' কাহিনীর জন্য আঁকা জন টিনিয়েলের ছবির মতোই রাজশেখরের গল্প আর যতীন সেনের ছবি হর-গৌরীর সম্পর্ক। 'গড্ডলিকা'র গ্রন্থ-সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে। একরকম স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহেই। তিনি লেখা ও রেখার মিল দেখে শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীও এ ব্যাপারে নিজের মুগ্ধতা স্বীকার করেছেন। রাজশেখর শিল্পীকে এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি নির্দেশ দিতেন, যেমন : 'অটল quite and amused 'পানুবাবুর মতো চুলের গড়ন' ; শ্যামবাবু = আঁচড়ানো দাড়ি চুল। কানের ডগায় চুল।' (শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের দুটি চরিত্র)। কিছুটা স্কেচ করেও বুঝিয়ে দিতেন। যতীন সেনও রাজশেখরের প্রবণতা চমৎকার ধরতে পারতেন।[৫]

নিজের নামে গল্প ছাপতে আপত্তি থাকায় 'পরশুরাম' ছদ্মনামটি নিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে সাহিত্যিক সুশীল রায়কে বলেছেন, 'দৈবক্রমে সেই সময় তারাচাঁদ পরশুরাম নামে এক কর্মকার কোম্পানির অন্যতম পার্টনার পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে তার নামটা নিয়ে নেওয়া হল। এই নামের পিছনে অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখব জানলে ও-নাম হয়তো নিতাম না।' দ্বিতীয় বই 'কজ্জলী' রাজশেখর — 'উপরিচর বসু' এই ছদ্মনামে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।[৬]

শেষ বয়সে নিজের বাড়িতে সম্বর্ধনাসভায় (১০ জানুয়ারি ১৯৬০) প্রত্যুত্তর-ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আসলে আমি আধা মিস্ত্রি, আধা কেরানী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ।' যে গল্প বাঙালিকে মাতিয়েছে সে গল্পকেও গুরুত্ব দেননি। বলেছেন, 'তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি বেশি নয়।'[৭]

কিন্তু এটা তাঁর বিনয়। তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বিপুল, দেখার চোখও অসাধারণ।

রাজশেখর 'রসসাহিত্যিক' অভিধা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর গল্পের গভীরতা ধরতে না পেরে এই ধরনের দুর্বল অভিধা ব্যবহারে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। বলতেন, 'রসসাহিত্যিক আবার কি ; আমি কি হাঁড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরী করি।'[৮]

তাঁর গল্প পাঠককে কতটা অভিভূত করতে পারে রাজশেখরকে লেখা চিঠিতে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি মন্তব্যই তার প্রমাণ 'আপনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি যদি হারিয়ে যায় আমাকে বলবেন, আমি স্মৃতি থেকে সমস্ত লিখে দোব'।[৯]

২

'চলন্তিকা' প্রণয়নের ইতিহাস এরকম : একবার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বানানের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য রাজশেখরকে একটি অভিধান প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেন। রাজশেখর জানান, এ কাজ একাধিক ব্যক্তি মিলেই সম্ভব। ঠিক হয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

কাজে নেমে রাজশেখরকে শেষ পর্যন্ত একাই এগিয়ে যেতে হল। তিনি প্রথমে যে সব বাংলা শব্দের একাধিক বানান আছে, তার একটি তালিকা করলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, যোগেশ বিদ্যানিধি, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কাছে তালিকাটি পাঠিয়ে, বানান নির্বাচনের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করলেন।[১০]

'চলন্তিকা' প্রথম প্রকাশ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক — এম. সি. সরকার। প্রথম মুদ্রণের সময় এর শব্দ সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার, পরে দাঁড়ায় তিরিশ হাজার। গ্রন্থটির

বই বইয়ের ঠিকানা

আকার নাতিবৃহৎ। সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী, প্রয়োজনে বহনও করা যায়। শব্দের মানে বোঝানোর জন্য অনেক সময় নির্দ্বিধায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দীর্ঘ ব্যুৎপত্তি, সন্ধি, সমাস-বিশ্লেষণ, পদান্তর প্রচুর প্রতিশব্দ — ইত্যাদি স্তূপীকৃত তথ্য নেই। তবে যেখানে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে, সেখানে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা আধুনিক চলতি বাংলা লিখতে গেলে, বিভিন্ন শব্দের যে বানান লেখা উচিত — এখানে তা পাওয়া যাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি (১৯৩৫) যে বানান অনুমোদন করেছেন, সেই সব বানান এখানে দেওয়া হয়েছে। বহু অচেনা শব্দের ইংরেজি করে, তাকে জানাশোনার আওতায় আনা হয়েছে। বহু শব্দের ইংরেজি পরিভাষাও দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে, বানান সংস্কার সমিতির সিদ্ধান্ত, পরিভাষার বিষয় অনুযায়ী তালিকা দেওয়া হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সার্থক আলোচনা, সর্বোপরি বাংলা ধাতুগুলিকে বীজগণিতের প্রথায় বা সংস্কৃত 'ইৎ' সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করে কুড়িটি 'গণে' ভাগ করে ধাতুরূপ দেখানো — তাঁর মতো বিরল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

বইটি প্রকাশের পর যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ, ১৩৩০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় কিছু কিছু ত্রুটি নির্দেশ করলেও ভারততত্ত্ব ও সংস্কৃতের এই মহাপণ্ডিত রাজশেখরের গ্রন্থকে স্বাগতই জানালেন। বাংলা ধাতুগুলিকে 'গণ' অনুযায়ী বিভক্ত করার চেষ্টাকেও তিনি সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তাঁর সমালোচনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে মত-পার্থক্য দেখালেও গ্রন্থটিকে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন, 'চলন্তিকার সংকলয়িতা... বাংলা চলিতভাষার আপাতদৃশ্যমান অরাজকতার মধ্যে নিয়মসূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার অভিধানের শেষে ব্যাকরণ বিষয়ক পরিশিষ্টের অবতারণা করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম এবং সার্থক গবেষণার ফল।' ('উত্তরা' কার্তিক ১৩৩৭)

সবচেয়ে বড় শিরোপা এল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ রাজশেখরকে পত্রে জানালেন, 'এতদিন পরে বাঙলা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে চলন্তিকায় বাঙলার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েছেন তাও অপূর্ব হয়েছে।' (দ্র. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮)

৩

'চলন্তিকা'র পরিশিষ্ট অংশের শেষে বিভিন্ন পরিভাষা বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাটীগণিত, বীজগণিত (রসায়ন বিদ্যা), বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি।

বাংলায় উপযুক্ত পরিভাষা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে রাজশেখরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষী বিভিন্ন রচনাকর্মের

প্রয়োজনে পরিভাষা সৃষ্টি করলেও, বাংলা পরিভাষা নিয়ে সংগঠিত ও সম্মিলিত চেষ্টা খুব একটা দেখা যায় না। পরিভাষা সংক্রান্ত সমস্যা মেটানো ও নতুন পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়। রাজশেখর বসু ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। সুনীতিকুমার, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন। রাজশেখর তাঁর অন্যান্য দায়িত্বের মতোই এটিও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। প্রমথনাথ বিশীও এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজশেখরের কর্মপদ্ধতি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা: 'সে ১৯৩৪ সালের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে, অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথম দিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি... হাতে কাগজের ফাইল গম্ভীর প্রসন্ন মুখ। সে প্রসন্নতা কতকটা স্বভাবের, কতকটা প্রতিভার।' 'ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলো পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী-জ্ঞানীব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নানা শাখার অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালির সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা। সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি একটি ক্ষুদ্র কথায় — শিখা জ্বেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল।'[১১]

৪

রাজশেখর বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কাশীরাম কৃত্তিবাস বা তুলসীদাসের মতো তাঁর রাম-কথা এবং মহাভারত চিরজীবী।

কৃত্তিবাসের রচনাকে আধুনিক বাঙালি পাঠক এড়িয়ে চলে। বর্ধমান রাজবাটির অনুবাদ দুষ্প্রাপ্য, দুরূহ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ বৃহদায়তন বলে তত জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কিন্তু রাজশেখর কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর কারণ রামায়ণ-কাহিনীকে তিনি উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় করেছেন। চলিতভাষা ব্যবহার, দুরূহতা, ও জটিলতা পরিহার, সর্বোপরি উপন্যাস সুলভ কাহিনীবৃত্ত — গ্রন্থটিকে আদ্যন্ত রমণীয় করেছে। স্থানে স্থানে মূল শ্লোকের ব্যবহারের কারণ মূলের স্বাদ বজায় রাখার চেষ্টা। রাজশেখরের ভাষায়, 'পাঠকের যদি রুচি না হয় তবে পড়বার সময় উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অগ্রাহ্য করতে পারেন।' ('ভূমিকা')

বই বইয়ের ঠিকানা

বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ বঙ্গাব্দে। এর তিনবছর পর মহাভারতের সারানুবাদ প্রকাশিত হয়। বিপুলায়তন সংস্কৃত মহাভারতের মর্যাদা অটুট রেখে তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন। এই অকল্পনীয় পরিশ্রম ও প্রযত্ন তিনি স্বভাবসিদ্ধভাবেই গোপন করেছেন। এতবড় কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। ভূমিকাতে নিজের অনুবাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।

মহাভারতের মতো উচ্চমর্যাদার গ্রন্থ চলিতভাষায় অনুবাদ করার জন্য কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। মূলের গাম্ভীর্য নাকি এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিভাব সরিয়ে, যুক্তি, জিজ্ঞাসা ও রসের দৃষ্টিতে এই মহাগ্রন্থটি পাঠক আস্বাদন করুক — সম্ভবত এটাই রাজশেখর চেয়েছিলেন।

অনুবাদের ভূমিকাতেও ভক্তিভাব নেই। এত সরল স্পষ্ট ও নির্মোহ ভূমিকাও কোনো অনুবাদে নেই। ভূমিকাতে তাঁর কিছু চমকপ্রদ মন্তব্য আছে। এই সব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, রাজশেখর ভক্তির বাতাবরণকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর আগে চলিতভাষায় এই দুই মহাগ্রন্থের এত ভালো অনুবাদ কেউ করেননি।

৫

রাজশেখর শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার অনুবাদও করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত ব্যাখ্যা'। এই বিচারে গীতার এ ধরনের দ্বিতীয় অনুবাদ আর নেই। অনুবাদের জন্য তিনি কেন গীতাকে বেছে নিয়েছেন, ভূমিকার অন্তে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'গীতার বহু প্রসঙ্গ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণা বিরোধী। জন্মান্তরবাদ, দেহ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্মশরীর (১৫/৮), দেবযান, পিতৃযান (৯/২৫) প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, এমন কি তাঁর ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হ'তে পারে। গীতার অনেক অংশ দুর্বোধ্য, ভাষ্যটীকাকারগণের ব্যাখ্যাও বহু স্থলে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহু পূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।'

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখরও অতি যত্নে গীতার অনুবাদ করেছিলেন। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে তিনি গীতার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অন্য অনেকের অনুবাদের সঙ্গে রাজশেখরের অনুবাদের থেকেও তিনি সাহায্য নিয়েছেন — একথা ভূমিকায় জানিয়েছেন। কথিত আছে, গিরীন্দ্রশেখর গীতার অনুবাদ করেছেন জেনে, রাজশেখর নিজের পাণ্ডুলিপি তুলে রেখেছিলেন। রাজশেখর অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

৬

রাজশেখরের কৃত মেঘদূত-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৩৫০ সালে। তাঁর অধিকাংশ বই-এর মতো এটিরও প্রকাশক এম.সি. সরকার এন্ড সন্স নয়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে। কালিদাসের 'মেঘদূতম্' বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন আনন্দচন্দ্র শিরোমণি (১৮৫০)। এটি গদ্যকে আশ্রয় করে করা হয়েছিল। অসংখ্য পদ্যানুবাদ থাকলেও গদ্যানুবাদের সংখ্যা বেশি নয়। রাজশেখর বসুর আগে পর্যন্ত মেঘদূতের গদ্যানুবাদ বারো-তেরোটি। বেশির ভাগই দুষ্প্রাপ্য।[১২]

বিভিন্ন সময়ে এই বিখ্যাত সংস্কৃত খণ্ডকাব্যটির অনুবাদ বহুব্যক্তি করলেও পূর্বসূরিদের থেকে তাঁর অনুবাদের পার্থক্য কোথায়, 'ভূমিকা'য় রাজশেখর তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন : '...পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হোক তা মূল রচনার ভাবালম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য।'

রাজশেখরের বহু গল্প আছে, যেগুলি তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার উপজাত বললে অত্যুক্তি হয় না। যেমন, রামায়ণচর্চার ফল : হনুমানের স্বপ্ন, চিরঞ্জীব, জাবালি। মহাভারত চর্চার উদাহরণ : ভীমগীতা, পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী। মেঘদূত-চর্চার ফল : 'অদল-বদল', (আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প)। গল্পটির মূলে আছে, একথা মনে করা যেতে পারে। তাঁর রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের মতো গল্পগুলিও বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

৭

রাজশেখরের প্রবন্ধ সংখ্যা ৬০-এর বেশি হবে না। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ তিনটি : 'লঘুগুরু' (১৯৩৯), 'বিচিন্তা' (১৯৫৫) ও 'চলচ্চিন্তা' (১৯৫৮)। এ ছাড়া বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের জন্য দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছিলেন : 'কুটির শিল্প' (১৯৪৩) ও 'ভারতের খনিজ'।

অথচ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গ কমই আসে। সম্ভাব্য কারণ: 'পরশুরাম'-এর প্রবল জনপ্রিয়তা, আর বোধহয় আমাদের উদাসীনতা।

তাঁর প্রায় সবকটি প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত আকারের। বিষয়বস্তু অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। আহার, আহার্য, ব্যসন, পরিধেয়, নীতি, ধর্ম, রাজনীতি, কুসংস্কার, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, ছন্দ, গণিত, সাহিত্যতত্ত্ব, ফলিত জ্যোতিষ, বানান, পরিভাষা — কী নেই তাঁর প্রবন্ধে। গল্প থেকে রাজশেখরকে চেনা শক্ত, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকে সেটা সম্ভব।

বিষয়-বৈচিত্র্য আরও অনেক প্রাবন্ধিকের রচনায় পাওয়া যাবে। কিন্তু রাজশেখরের প্রবন্ধ লঘুভার, অথচ জানা ও ভাবার মতো অনেক কিছু আছে তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধের অতিরিক্ত প্রাপ্তি হালকা পরিহাসের ভঙ্গি। অনায়াস লঘু পরিহাসে প্রবন্ধের সূচনা ক'রে, আকৃষ্ট পাঠককে ধীরে ধীরে টেনে এনেছেন বক্তব্যের গভীরে :

বই বইয়ের ঠিকানা

আন্তর্জাতিক ক্ষমতার রাজনীতি প্রসঙ্গে —

'আধুনিক প্রাণীদের মধ্যে তিমি সবচেয়ে বড়। এই জন্তুটি মহাকায়, কিন্তু সাধারণত ক্ষুদ্রভোজী, ছোট ছোট মাছ শামুক ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারণ করে। পুরাণে আর একরকম জলজন্তুর উল্লেখ আছে — তিমিংগিল, যারা এত বড় যে তিমিকে গিলে খায়। পৌরাণিক কল্পনা এখানেই নিরস্ত হয় নি, তিমিংগিলেরও ভক্ষক আছে, যার নাম তিমিংগিল গিল...'। 'জন্তুদের মধ্যে যেমন তিমি, দেশের মধ্যে তেমন আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইন্ডোচীন প্রভৃতি। এসব দেশ আকারে বৃহৎ, কিন্তু ক্ষুদ্রভোজী অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট। এদের অল্পাধিক পরিমাণে কবলিত ক'রে যারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তারা তিমংগিল জাতীয় ; যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইটালি, জাপান।' ('তিমি', 'লঘুগুরু')

গণিতশাস্ত্র : অসীম সংখ্যা প্রসঙ্গে —

'শ্রী প্রমথ বিশীর কোনও বইএ পড়েছি, অক্ষয়কুমার দত্ত অহরহ ভাবতেন, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড। শেষ বয়সে তাঁর মাথার অসুখ হয়েছিল, নিরামিষ ছেড়ে আমিষ খেতে শুরু করেছিলেন। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাই বোধহয় তাঁর অসুখের কারণ। ('রাশিরাশি', 'চলচ্চিন্তা')

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ প্রসঙ্গে —

'রাম আর শ্যাম ঘোড়া নিয়ে তর্ক করছে। রাম সজোরে বলছে, ঘোড়ার মাপ অন্তত তিনহাত। ততোধিক জোরে শ্যাম বলছে, ঘোড়া দেড় ইঞ্চির বেশী হতে পারে না। এরা কেউ দু রকম অর্থ স্বীকার করে না। ঘোড়া বললে রাম বোঝে যে-ঘোড়া ঘাস খায়, আর শ্যাম বোঝে যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়।'...

'সাহিত্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে তর্ক শোনা যায় তা অনেকটা যদু-মধুর তর্কের তুল্য। তর্ককারীরা নিজের নিজের পছন্দসই গণ্ডির মধ্যে সাহিত্য শব্দের অর্থ আবদ্ধ রাখতে চান।'...

'অক্রূর সংবাদ' গল্পে ('ধুস্তুরী মায়া') অক্রূর নন্দী বলেছে, 'ক্যালরি প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড আর ভাইটামিনের হাড়হদ্দ আমার জানা আছে, তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি গুলে খেয়েছি, আর এই মাষ্টারনী আমাকে লেকচার দিচ্ছে।' গল্পে অক্রূরের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, কিন্তু রাজশেখর, যাঁর বহু কিছুর হাড়হদ্দ জানা আছে, তিনি কিন্তু পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সহজ ভাবেই সব কিছু বলেছেন। 'সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।' — বঙ্কিমোক্ত এই গুণ ও ক্ষমতা সহজলভ্য নয়। একসময়ে 'প্রবাসী'র সমালোচকের চোখে রাজশেখরের এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল : 'লঘুগুরু'র আলোচনায় সমালোচকের মন্তব্য: 'রাজশেখর বাবুর কথা বলিবার ধরনে পাণ্ডিত্যের বৃথা বহ্বাস্ফোটন নাই — অথচ সুযুক্তির সঙ্গে তিনি কাজের অবতারণা করিয়াছেন, ধীরভাবে বিচারের সঙ্গে নিজের

রায় দিয়াছেন। বাংলাদেশে যে জিনিসটি নিতান্ত দুর্লভ, সেটি রাজশেখরবাবু চিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গিকে বিশেষ করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে সেটি হইতেছে, সহজ, সরল অথচ কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টি।' '...তাঁহার লেখা পড়িয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত হাস্যরস উপভোগ করিবেন।' (আশ্বিন, ১৩৪৭ সংখ্যা)

রাজশেখরের প্রবন্ধ-চর্চার মূল কারণ উনিশ ও বিশ শতকের অনেক মনীষী লেখকের মতোই — স্বজাতির মঙ্গল-চিন্তা। 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মানুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন' — পরশুরাম ও রাজশেখর বঙ্কিমের এই উক্তিকে শিরোধার্য করেছেন।

'পরশপাথর'-এর লেখক যেখানেই হস্তার্পণ করেছেন সেখানেই সোনার ফসল ফলেছে। তবে অনুবাদক, ভাষাবিদ ও প্রাবন্ধিক রাজশেখরকে কোনোদিন লোকে ভুললেও, পৌরাণিক পরশুরামের মতো আধুনিক পরশুরাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকরঃ চিরজীবী।

বই বইয়ের ঠিকানা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ : উৎস-নির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'গড্ডলিকা'র সমালোচনা : 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩২ পৃ ২১৫, ২১৬

২। দীপংকর বসু, 'জিনিয়স সান্নিধ্যে', 'কোরক', রাজশেখর বসু সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ ২৭

৩। দীপংকর বসু, 'পরশুরাম গল্পসমগ্র', 'অবতরণিকা — অনন্তে', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৯৯২, পৃ ৮২৫

৪। কল্যাণী ঘোষ, 'রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য', ফার্মা কেএলএমপ্রা. লি. ১৯৮৩, পৃ ৯৭

৫। দীপংকর বসু, 'অপ্রকাশিত রাজশেখর', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৯৮১, পৃ ৩৩ (পরশুরাম অঙ্কিত ছবির খসড়া ও মন্তব্য)

৬। দীপেন সাহা, 'রাজশেখর বসু', বাগর্থ, ১৯৭২ পৃ ১৩

৭। 'কথা সাহিত্য', কার্তিক ১৩৬৮ সংখ্যা

৮। 'অপ্রকাশিত রাজশেখর' ... পৃ ৭

৯। পরশুরাম গল্পসমগ্র ..., 'বক্তব্য' : দীপংকর বসু, পৃ ৩৫

১০। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সাপ্তাহিক 'অমৃত', ২৯.৯.১৯৭৮ সংখ্যা

১১। প্রমথনাথ বিশী, 'ভূমিকা', 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ড, ১৩৯৪, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৮

১২। নরেশচন্দ্র জানা, 'অনুবাদে মেঘদূত : সার্ধশতবর্ষ', প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, ১৯৯১, পৃ ১০, ১১

রাজশেখর বসু : তথ্যপঞ্জি

১৮৮০

জন্ম - ১৮ মার্চ, বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে।

১৬ মার্চ, ১৮৮০ তারিখটি সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও, রাজশেখর বসু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে পরবর্তীকালে ১৮ মার্চ তারিখটি গ্রহণীয় বলে নির্দেশ করেছেন। বাংলা তারিখ ৪ চৈত্র, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ। (দ্র. দীপংকর বসু, 'অপ্রকাশিত রাজশেখর', ১৯৮১, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি.)

১৮৮৪

কৃষ্ণশেখর বসুর জন্ম (১৮৮৪ — ১৯৭১)

১৮৮৬

পত্নী মৃণালিনীর জন্ম (১৮৮৬ — ১৯৪২)

১৮৮৭

গিরীন্দ্রশেখরের জন্ম (৩০.১.৮৭ — ৩.৬.১৯৫৩)। রাজশেখরের জীবনের প্রথম সাত বছর কাটে মুঙ্গের জেলার খরকপুরে।

১৮৮৮

সম্ভবত এইসময় থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গা রাজ হাইস্কুলে ছাত্র ছিলেন।

১৮৯৫

এনট্রান্স পাস। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বাঙালি। পাটনা কলেজে এফ.এ.তে ভর্তি।

১৮৯৭

দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি : রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স।

১৮৯৯

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্সসহ বি. এ. পাস। এই বছরই বিবাহ।

১৯০০

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম. এ.। দ্বিতীয়শ্রেণীতে প্রথম। রসায়নে প্রথম শ্রেণী এ বছর কেউ পাননি।

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯০১

কন্যা প্রতিমার জন্ম। বেঙ্গল কেমিক্যালের সূচনা। দ্বারভাঙ্গা রাজ হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে গিরীন্দ্রশেখরের এনট্রান্স পাস।

১৯০২

আইন পাস (বি. এল.)। ওকালতি শুরু ও শেষ। এই বছর ১৬ মে থেকে চন্দ্রশেখরের অবসর গ্রহণ। অবসরের আগে পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটে ম্যানেজার।

১৯০৩

বেঙ্গল কেমিক্যালে কেমিস্ট হিসেবে যোগদান।

১৯০৪

বেঙ্গল কেমিক্যালে ম্যানেজার পদ লাভ।

১৯০৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গিরীন্দ্রশেখরের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি. এসসি. পাস। বিষয় : রসায়ন ও শরীরবিদ্যা।

১৯০৭

গিরীন্দ্রশেখরের প্রিলিমিনারি সায়েন্টিফিক এম. বি. পাস। প্রথম বিভাগ।

১৯০৮

ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন গিরীন্দ্রশেখর। দ্বিতীয় বিভাগ।

১৯১০

গিরীন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় বিভাগে সেকেন্ড এম. বি. পরীক্ষা পাস। মনোচিকিৎসাকে পেশা হিসাবে নিলেন।

রাজশেখরের পরিচালনায় বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীবৃদ্ধি। নানা ধরনের টয়লেট দ্রব্য উৎপাদন শুরু এই সময় থেকেই।

১৯১১

ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে গিরীন্দ্রশেখরের লেকচারার পদ গ্রহণ (১৯১১-১৯১৫)।

১৯১৩

চন্দ্রশেখরের মৃত্যু।

১৯১৭

নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে গিরীন্দ্রশেখর অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এসসি. পাস করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও

২০০ টাকার পুরস্কার লাভ। সকল বিষয়ের এম.এসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান পাওয়ার জন্য হেমচন্দ্র গোঁসাই স্বর্ণপদক ও পুরস্কার (৫০০ টাকা) প্রাপ্তি।

১৯১৯

এইসময় বা এর কিছুকাল আগে থেকে উৎকেন্দ্র সমিতির আড্ডা শুরু। স্থান : ১৪ নম্বর পার্শিবাগান, রাজশেখর ও তাঁদের ভ্রাতাদের পৈতৃক বাসভবন।

১৯২১

মনের অবদমন সম্পর্কিত গবেষণা করে গিরীন্দ্রশেখরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এসসি ডিগ্রী লাভ। অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিতে এই প্রথম ডি.এসসি।

১৯২২

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশ, 'ভারতবর্ষ', মাঘ ১৩২৯। 'শ্রীপরশুরাম বিরচিত' ও 'শ্রীনারদ চিত্রাঙ্কিত'।

গিরীন্দ্রশেখর কর্তৃক 'ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

১৯২৪

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'গড্ডলিকা' প্রকাশ। একবছরের মধ্যে প্রথম মুদ্রণ শেষ।

১৯২৫

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'গড্ডলিকা'র সমালোচনা : 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। পরশুরামকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কৃত্রিম মসিযুদ্ধ।

'ভারতীয় মনোবিদ্যা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা (১৫ জানুয়ারি)। গিরীন্দ্রশেখর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২৬

এই বছরের গোড়ায় অমল হোমের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে রাজশেখর তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

১৯২৮

'কজ্জলী' প্রকাশ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে সস্ত্রীক মাদ্রাজ-ভ্রমণ : ১৫ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল।

গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। প্রবন্ধগুলি 'উৎকেন্দ্র সমিতি'তে পঠিত হয়েছিল।

১৯২৯

কলকাতা বিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান হলেন গিরীন্দ্রশেখর।

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯৩০

'চলন্তিকা' প্রকাশ। গিরীন্দ্রশেখরের শিশুপাঠ্য সচিত্র 'লালকালো' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩১ 'চলন্তিকা' পেয়ে রাজশেখরকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১১.২.১৯৩১)। এই সময়ে সুকিয়া স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন রাজশেখর।

১৯৩৩

বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অবসর গ্রহণ : ১ জানুয়ারি। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিক খোলা হল। অধিকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর।

১৯৩৪

১৫ এপ্রিল কন্যা প্রতিমার মৃত্যু। তিনঘন্টা পরে জামাতা অমরনাথের।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিভাষা সমিতির কাজ শুরু ; সভাপতি : রাজশেখর।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে ৭ জন কর্মাধ্যক্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেলেন রাজশেখর।

গিরীন্দ্রশেখরের 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থটির প্রকাশ।

১৯৩৫

এই বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির কাজ শুরু। সভাপতি : রাজশেখর। সম্পাদক : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

২৬ সেপ্টেম্বর ক.বি.-এর উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লাইনোটাইপ যন্ত্রের উদ্বোধন। লাইনো টাইপের অক্ষর বিন্যাসের মূলে রাজশেখর ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

১৯৩৬

উত্তরবঙ্গের বন্যার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কর্তৃক ত্রাণ কমিটি গঠিত হল। কমিটিতে রাজশেখরও থাকলেন। কমিটির কাজ শেষ হলে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ হিসাব পেশ করে সকলের শ্রদ্ধা-অর্জন করেছিলেন রাজশেখর।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'খাপছাড়া' উৎসর্গ।

'রবিবাসর' নামক সাহিত্যিক আসর প্রতিষ্ঠিত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় রাজশেখর সভ্য হলেন।

১৯৩৭

'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থটি প্রকাশ।

১৯৩৮

কলকাতার তিলজলা এলাকায় বেদিয়াডাঙ্গা রোডে কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের বাড়ি ও জমি ভারতীয় মন : সমীক্ষক সমিতিকে দান করলেন রাজশেখর ; পরবর্তীকালের লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হসপিটালের সূচনা।

১৯৩৯

'লঘুগুরু' প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ।

১৯৪০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ। ৫ ফেব্রুয়ারি 'লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হসপিটাল' চালু। লুম্বিনী পার্ক নামক বাড়িটি দান করেন রাজশেখর।

১৯৪১

প্রদৌহিত্র দীপংকর বসুর জন্ম : ১৯ জুন।

'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৯৪২

১১ নভেম্বর পত্নী মৃণালিনীর মৃত্যু।

১৯৪৩

গ্রন্থ প্রকাশ : 'কুটির শিল্প', 'ভারতের খনিজ', 'কালিদাসের মেঘদূত'।

কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুকাল ভাগলপুরে বসবাস। উঠেছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজার কাছারি বাড়িতে। 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এইসময় নানা ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

১৯৪৪

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের সমালোচনা।

১৯৪৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী পদক লাভ। গ্রন্থ প্রকাশ : 'গামানুষ জাতির কথা', প্রকাশক : কবিতাভবন।

১৯৪৬

বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ প্রকাশ।

১৯৪৭

২ নভেম্বর রাজশেখরের বাড়িতে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য গঠিত পরিভাষা সংসদের অধিবেশন। সভাপতি : রাজশেখর। অন্যান্য সদস্য : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, পতঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বই বইয়ের ঠিকানা

গিরীন্দ্রশেখরের উদ্যোগে ইংরেজি ত্রৈমাসিক 'Somiksa' (সমীক্ষা) প্রকাশ।

শান্তিনিকেতনে অমিতাভ চৌধুরীর পরিচালনায় 'ভুশণ্ডীর মাঠে' অভিনয়। রাজশেখর উপস্থিত।

১৯৪৮

'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা' প্রকাশ। প্রকাশক : পরিভাষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৮। প্রথম মুদ্রণের ভূমিকায় সাতজনের মধ্যে প্রথম নাম রাজশেখর বসু।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' গ্রন্থের সমালোচনা।

১৩ এপ্রিল শ্রীরঙ্গমে 'ভুশণ্ডীর মাঠে'। ১১ জুলাই নিউ এম্পায়ারে পুনরায় মঞ্চস্থ। মূল উদ্যোগ : অমিতাভ চৌধুরী। গিরীন্দ্রশেখরের 'ভগবদ্‌গীতা' (অনুবাদ) প্রকাশ।

১৯৪৯

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারতের সারানুবাদ প্রকাশ।

১৯৫০

'গল্পকল্প', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রকাশ। 'কথাসাহিত্য' বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৫৭) একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ : 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'।

১৯৫১

'চলন্তিকা' অভিধানের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৫২

'ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প' প্রকাশ।

ভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রচনা। তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫২।

১৯৫৩

'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' প্রকাশ। গিরীন্দ্রশেখরের মৃত্যু : ৩ জুন, সন্ধ্যা ছ'টা। 'কথাসাহিত্য' রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশ (শ্রাবণ, ১৩৬০)

১৯৫৪

'বনফুল'কে লেখা কবিতা : 'কথাসাহিত্য' আষাঢ় ১৩৬৪।

'আনন্দ মিস্ত্রী' গল্প, 'গল্পভারতী' শারদীয় ১৩৬১।

১৯৫৫

'বিচিন্তা' প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি।

শশিশেখরের মৃত্যু ২৬ ফেব্রুয়ারি। (শশিশেখর বসু — জন্ম : ১ ভাদ্র, ১২৮১, মৃত্যু : ১৪ ফাল্গুন ১৩৬১) রাজশেখরের উদ্যোগে 'যা দেখেছি, যা শুনেছি' প্রকাশ।

১৯৫৬

'পদ্মভূষণ' সম্মান প্রাপ্তি।

'নীলতারা ইত্যাদি গল্প' প্রকাশ।

১৯৫৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট সম্মান প্রদান।

'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প' প্রকাশ।

১৯৫৮

'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প' বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট প্রদান।

'সাহিত্য তীর্থ' সংস্থার পক্ষ থেকে রাজশেখরের গৃহে রাজশেখরকে সংবর্ধনা (অক্টোবর)।

১৯৫৯

'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প' প্রকাশ। অসুস্থতা বৃদ্ধি। অকস্মাৎ স্ট্রোক।

১৯৬০

১০ জানুয়ারি লেখক ও সাহিত্যিকগণ কর্তৃক সংবর্ধনা। স্থান : রাজশেখরের বকুলবাগানের বাড়ি।

১৩ বৈশাখ, ১৩৬৭, ইং ২৭ এপ্রিল বেলা একটা থেকে সওয়া একটার মধ্যে মৃত্যু।

বই বইয়ের ঠিকানা

রাজশেখর বসু : রচনাপঞ্জি

গড্ডলিকা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩১	পাঁচসিকা
কজ্জলী		১৩৩৫	
চলন্তিকা	সুধীরচন্দ্র সরকার	১৩৩৭	দু টাকা বারো আনা
হনুমানের স্বপ্ন	এম.সি. সরকার এন্ড সন্স লি.	১৩৪৪	দেড় টাকা
লঘুগুরু	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস	১৩৪৬	এক টাকা
কুটির শিল্প	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-২)	১৩৫০	ছ আনা
কালিদাসের মেঘদূত	বিশ্বভারতী	১৩৫০	দেড় টাকা
ভারতের খনিজ	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-৭)	১৩৫০	আট আনা
গামানুষ জাতির কথা	কবিতাভবন	১৩৫২	
বাল্মীকি-রামায়ণ (সারানুবাদ)	এম.সি.সরকার এন্ড সন্স	১৩৫৩	সাড়ে পাঁচ টাকা
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত (সারানুবাদ)	এম.সি.সরকার...	১৩৫৩	ন টাকা
গল্পকল্প	এম.সি.সরকার...	১৩৫৭	আড়াই টাকা
হিতোপদেশের গল্প	বিশ্বভারতী	১৩৫৭	এক টাকা বারো আনা
ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প	এম.সি. সরকার...	১৩৫৯	তিন টাকা
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প	এম.সি. সরকার...	১৩৬০	দু'টাকা আট আনা
বিচিন্তা	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি.	১৩৬২	দু'টাকা চার আনা
নীলতারা ইত্যাদি গল্প	এম.সি.সরকার...	১৩৬৩	তিন টাকা
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প	এম.সি. সরকার...	১৩৬৪	তিন টাকা
চলচ্চিন্তা	মিত্র ও ঘোষ	১৩৬৫	তিন টাকা
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প	এম.সি.সরকার...	১৩৬৬	তিন টাকা

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

পরশুরামের কবিতা	এম.সি. সরকার...	১৩৬৭	দু'টাকা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	এম.সি. সরকার...	১৩৬৮	সাড়ে তিন টাকা
অপ্রকাশিত রাজশেখর	এম.সি. সরকার...	১৩৮৭	পাঁচ টাকা

রচনাবলী

'পরশুরাম রচনাবলী', ভূমিকা : প্রমথনাথ বিশী, ১-৩ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৬, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স।

'রাজশেখর রচনাবলী', ভূমিকা : হরপ্রসাদ মিত্র, ১-৩ খণ্ড, প্র. প্র. ১৩৮৫, এম. সি. সরকার...

'পরশুরাম-গল্পসমগ্র', সম্পাদনা : দীপংকর বসু, কার্তিক ১৩৯৯, এম. সি. সরকার...

গল্পের নাট্যরূপ

'চিকিৎসা সঙ্কট (নাট্যরূপ : যতীন্দ্রকুমার সেন), এম.সি. সরকার... প্র. প্র. ১৩৩৫

'লম্বকর্ণ পালা' (নাট্যরূপ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), শারদীয় 'দেশ'... প্র. প্র. ১৩৫৬

'ভুশণ্ডীর মাঠে' (নাটরূপ : অমিতাভ চৌধুরী), এম.সি. সরকার... প্র. প্র. ১৩৮৭

বই বইয়ের ঠিকানা

পরশুরামকে নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কৃত্রিম মসিযুদ্ধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিযোগ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শেষ বয়সে আপনাকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। চরকার সপক্ষে বিপক্ষে যাহাই লিখুন না কেন তাহাতে বরং সমাজের উপকারই : এ বিষয়ে যত বাদানুবাদ হয় ততই ভালো। এই প্রবন্ধের সপক্ষে বিপক্ষে অনেকেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন; ইদানীং মহাত্মা গান্ধীও আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি অনেক সভায় বলি, যখন "বড়-দাদা" আমাদের দিকে, তখন "ছোট-দাদা"কে ভয় করি না — সে দিন আপনার সামনে হিসাব করিয়া দেখিলাম আপনি আমার অপেক্ষা তিন মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ।

সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "গড্ডলিকা" প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্যসম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ-প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন "কেষ্ট-বিষ্টু"! সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

আর-একটি কথা! —আপনি তো এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতেছেন। শুনিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত তিন বৎসর বয়সেই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং পোপ নাকি কিশোর বয়সেই বলিয়াছিলেন —

Father father mercy take
I shall no more verses make!

অনেকে বলিয়া থাকেন যে চল্লিশ বৎসরের পর নূতন ধরণের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না; কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন : কিন্তু গ্যালিলিও সেই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্কার করেন : আবার (Schumann) শুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর জড়-বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত

করেন। রিচার্ডসন (Father of English novelists) পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে, যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল্ লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর-একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে, পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে : কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।

ভবদীয়
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বই বইয়ের ঠিকানা

রবীন্দ্রনাথের জবাব

সুহৃদ্বর,

বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানসরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্যসরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলছে। খুলে দেখি যাকে ইংরেজিতে বলে টেবিল ফেরানো — আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিক পত্রে ছোটগল্প আর মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি. এসসি, কাউকে ডি. এসসি লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিক পত্রবলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভুশণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন — আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি; বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগব, যে সব জন্মসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আপনার আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা যাবে।

ইতি ১৮ অঘ্রাণ ১৩৩২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত)

পরশুরাম-প্রশস্তি

যতীন্দ্রকুমার সেন

যে ছদ্মনামে তিনি সুধীসমাজে সুপরিচিত, সে নাম — পরশুরাম। তাঁর পিতৃদত্ত নাম — রাজশেখর বসু। যে রচনার প্রথম প্রকাশ সারা বাংলা দেশকে অভিভূত করে সে রচনা 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এই লেখাতে তিনি প্রথম পরশুরাম নামে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর পরের সমস্ত লেখাতেই ঐ ছদ্মনাম সংযুক্ত থাকে। রাজশেখরের পারিবারিক নাম — ফটিক। সুনির্মল কলঙ্কশূন্য স্বভাবজাত স্ফটিকের মত তিনি ছিলেন অতুলনীয় দৈহিক রূপের চরিত্রের মানসিক শক্তির ও নির্মল অন্তঃকরণের অধিকারী। অল্প বয়সে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের কার্যভার গ্রহণ করেন। পরম কারুণিক মহাকাল রাজশেখরকে তাঁর শান্তিময় কোলে তুলে নিয়ে চিরবিশ্রাম দান করেছেন। মৃত্যুর এমন অপূর্ব মাধুর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। ৮০ বৎসর পূর্ণ করে কয়েক মাসের জন্যে ৮১তে পা দিয়ে অমরধামে চলে গেলেন। তাঁর বহুদিনব্যাপী কর্মময় জীবনে তিনি বাংলা দেশ ও ভারতকে স্বর্ণখনিতুল্য যে অমূল্যসম্পদ দান করে গেছেন, তা দেশ কখনও ভুলবে না।

নানা সদ্‌গুণমণ্ডিত বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত সহৃদয় অতিথিবৎসল অহংকার অহমিকাশূন্য এমন মানব লোকসমাজে বিরল। 'যষ্টিমধু'র পৃষ্ঠপোষক রসরচনাগুণগ্রাহী পরশুরাম আজ ইহলোক ছেড়ে গেলেও তাঁর অনাহুত শুভেচ্ছা ও অদৃশ্য আন্তরিক সঙ্গ কখনও ঘুচবে না। পরশুরামই 'যষ্টিমধু'তে টেনে এনে আমাকে ধন্য করে গেছেন। তিনি জীবনে অনেক নিদারুণ শোক পেয়েছেন, কিন্তু অপরাজেয় মানসিক শক্তিবলে সব সহ্য করে গেছেন। কখনও কোন দিন ভেঙ্গে পড়েননি।

৮১ বছরে পড়লে বাড়িতে সামান্য আহারের আয়োজন, ৮১টি প্রদীপ জ্বালা, ১টি ফুলের মালা ও একখানি নতুন কাপড় পরাবার উদ্যোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন নিরামিষ ও স্বল্পহারী। খেতে এসেই প্রদীপ দেখে নিবিয়ে দিতে বলেন — কারো অনুরোধ শোনেন নি। অদৃষ্টের পরিহাসের মত ৮১টি প্রদীপ নিবে গেল, ফুলের মালা কিছুতেই গলায় দিলেন না। নতুন কাপড়খানি স্নেহের পুত্তলী নাতনী শ্রীমতী আশা ও তার একমাত্র পুত্র শ্রীমান দীপংকরের আন্তরিক ধরাধরিতে পরে খেতে বসলেন।

সোদরপ্রতিমঅগ্রজ পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসুর সঙ্গে কিশোর বয়স থেকে আমার সাহচর্য। তাঁর পদতলে বসে আমি অনেক জ্ঞান, অনেক অপ্রার্থিত সাহায্য পেয়েছি। তাঁর সুগভীর স্নেহচ্ছায়া আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিল। তিনি আমাকে ৭৮ বছর বয়েসে রেখে চলে গেলেন। কিন্তু আমি জানি, শুধু আমার মন থেকে নয়, এ দেশের মন

বই বইয়ের ঠিকানা

থেকেও তিনি কখনও যাবেন না। তাঁর স্মৃতি চিরজাগরুক থাকবে।

মহামানবের মৃত্যুতে শোক অবিধেয় — তাঁদের মৃত্যু নেই :

যথা, জীর্ণবাস করি পরিহার
পরে নর বসন অপর,
তেমতি দেহী পরিত্যাজি যায়
ধরিতে হে নব কলেবর।

('যষ্টিমধু' বৈশাখ, ১৩৬৭)

রাজশেখর : নানা চোখে

অন্নদাশঙ্কর রায়

'তাঁর মৃত্যুর খবর এলো শান্তিনিকেতনে বৃহস্পতিবার সকালে। অভাবনীয় ঘটনা। মনটা সারাদিনই বিমর্ষ হয়ে রইল। রাজশেখরবাবু যেতেই চেয়েছিলেন, যেভাবে গেলেন তার চেয়ে ভালোভাবে কে কবে গেছেন। এ মৃত্যু সাধুসজ্জনের মৃত্যু। কর্মনিষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু এর জন্য সাধনা করতে হয়। প্রস্তুত হতে হয়। রাজশেখরবাবু একে বহু তপস্যায় অর্জন করেছেন। জীবনের শেষে এটি একটি পূর্ণচ্ছেদ। তাঁর সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে 'ইতি' লিখে দাঁড়ি টেনে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে তিনি তাঁর জীবনলিপি সমাপ্ত করলেন।'[১]

অমৃতলাল বসু

'আপনি এত ভাল লেখেন — এত ভাল? কি লজ্জা যে আমি এতদিন কিছু পড়িনি। ... যে-ভাবে চরিত্র ফলাতে বর্ণনাদি দিতে আপনি পারেন, দৈবশক্তি (genius) সম্পন্ন না হলে কেউ তা পারেন না। ... আপনার ভুশণ্ডীর মাঠের ভূতের হাট দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেছি। ... যদি আপনার মতো লিখতে পারতেম। এ চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না।'[২]

কুমারেশ ঘোষ

'জয়হরির জেব্রা' গল্পের একটা ইতিহাস আছে। আমরা তখন দ্বারভাঙ্গায় থাকতাম। আমাদের বাড়ির সামনে এক ফিরিঙ্গী ভদ্রলোকের বেড়াল পোষার সখ ছিল। তিনি বেড়ালগুলোর এক একটাকে এক এক রঙে চুবিয়ে রঙ্গীন করতেন। বেড়ালের লোম চট করে ভিজে যায় — কথায় বলে না, ভিজে বেড়াল? আর রঙ উঠতেও চায় না গা থেকে সহজে। আর মজা হ'তো রাস্তার কুকুরগুলো বেড়ালগুলোকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাত।'[৩]

[কুমারেশ ঘোষকে রাজশেখর]

গোপাল হালদার

'ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগ রাজশেখরবাবুর আধুনিক কালের বিজ্ঞানানুরাগের থেকেও কম ছিল না। গিরীন্দ্রশেখর বাবুর মুখে শুনেছি — একবার তিনি (গিরীন্দ্রবাবু)

বই বইয়ের ঠিকানা

উপস্থিত অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — 'কোন যুগে জন্মালে তুমি খুশি হও — অতীতে না ভবিষ্যতে?' (ওটা বোধহয় তাঁর মনোবিশ্লেষণের একটা জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন)। রাজশেখরবাবু জানিয়েছিলেন — 'অতীতে', কিন্তু যুগটা আমাকে বেছে নিতে দিতে হবে — গুপ্তযুগের পরে নয়।'[৪]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

'আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাই এই লাইনো টাইপকে বাজারে চালু করেছেন, কিন্তু তার আগে রাজশেখরবাবু মাথা খাটিয়ে যুক্তাক্ষরের জট ছাড়িয়েছেন এবং শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন হরফগুলির অঙ্কন কার্য সমাধা করেন। বাংলা লাইনোতে প্রথম পুরোপুরি ছাপা বই পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন' দ্বিতীয় সংস্করণ।'[৫]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এলেন। অবাক হয়ে গেলাম।

প্রসন্ন সৌম্য গৌরবর্ণ মানুষটি, অনাড়ম্বর বেশভূষা, শান্ত গম্ভীর প্রৌঢ়ত্বের শুভ্রতা ও শুচিতা তাঁর সর্বাঙ্গে, দৃষ্টিতে আত্মীয়তার প্রসন্নতা, বাক্যে সবিনয় মাধুর্য অথচ উত্তরগুলি দৃঢ়-প্রত্যয়বাচক। এইরকম একটি মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়।'[৬]

দীপংকর বসু

'আরেকটি বেড়ালকে এইসময় একেবারে তাঁর গা ঘেঁষে শুয়ে থাকতে দেখা যেত। কাঞ্চনবর্ণ, স্থূল-লাঙ্গুল দীর্ঘরোমবিশিষ্ট এই বেড়ালের তিনি দুটো নাম দিয়েছিলেন — কাঞ্চনকান্তি বসু, (অর্থাৎ ফোকলা দাঁত — সামনের কয়েকটা দাঁত ছিল না বলে) ও লাঙ্গুল-ভূষণ।...' 'বিকেলের বারান্দায় মাঝে মাঝে এদের তাঁর কোলে বা বুকে চড়ে বসে থাকতে দেখা যেত। প্রায়ই বলতেন — 'এটা আমার পক্ষে গর্বের বিষয়। সেকালে যেমন মুনি-ঋষিরা সর্ব প্রাণীকে অভয় দিতেন তাঁরা তাঁদের হাত থেকে নির্ভয়ে খাবার খেয়ে যেত, এরাও তেমনি আমার কাছ থেকে অভয় পেয়েছে।'[৭]

পরিমল গোস্বামী

'রাজশেখর শিশু বয়সে হিন্দি ভিন্ন বলতেন না, দু বছর বয়সে আবদার ধরছেন 'হাম বাঘ দেখেগা তব দুধ খায়েগা।' তখন আট বছরের শশিশেখর তাকে বলছেন 'তোম দুধ নেহি পিয়েগা তো বাঘ নেহি আওয়ে গে।' 'তখনকার বাঙ্গালীরা বলতেন এ ছেলে কখনই বাংলা শিখবে না, বাপমার সঙ্গেও হিন্দি।'[৮]

প্রমথ চৌধুরী

'ভুশণ্ডীর মাঠে'র তুলনা নেই। এ ছবিটি আগাগোড়া কল্পনা-প্রসূত, কিন্তু কি আশ্চর্য্যরকম realistic! আমি ভূতকে বেজায় ভয় করি, কিন্তু ভুশণ্ডীর মাঠের যক্ষ নাদু মল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তাকে 'Very pleased to meet you sir না বলে' থাকতে পারতুম না।'[৯]

প্রমথনাথ বিশী

'হাস্যরসসৃষ্টির একটি চিরাচরিত পন্থা অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশ। সকলকেই অল্পবিস্তর এ পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। এ গুণটিতে পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

সত্যব্রতর উক্তি, 'সাণ্ডেল মশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আর আমি ভাবছি আরসোলা।''

শূর্পণখা বিরহ দুঃখ বর্ণনা করছে এমন সময় ভাইঝি পুষ্কলা জিজ্ঞাসা করে বসে, 'পিসি, তুমি ঋষি খেয়েছ?'

'দি অটোমেটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ', 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক', 'শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী', ... 'লালিমা পাল (পুং)' ... এমন উদাহরণ শত শত উদ্ধার করা যেতে পারে।'[১০]

বিজয়কেতু বসু

'তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়কর তথ্য ও ঘরোয়া প্রয়োগ আমায় আকৃষ্ট করত। তাঁর নিজের হাতে তৈরী Sundial বাগানে বসান ছিল আর ঘড়ির মতো দেখতে Hygrometer দোতলার বারান্দায় রাখা থাকত। খিচুড়ি আর সন্দেশ দুটোর কোনটা বেশি টেকে, তার একটা কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা করেছিলেন। দুটি চওড়া মুখের কাঁচের শিশির একটিতে ঘরে রান্না করা খিচুড়ি আর অন্যটিতে দোকানের সন্দেশ রেখে শিশি দুটি auto clave করে লেবেলে তারিখ লিখে সীল করে দেন। ঠিক এক বছর বাদে শিশি খুলে খেয়ে দেখেন। তাঁর মতে সন্দেশের স্বাদ অনেক বিকৃতি হলেও খিচুড়ির স্বাদে বিকৃত হয় নি।'[১১]

বুদ্ধদেব বসু

বহুকাল আগে কোন কাজে বেঙ্গল কেমিক্যালের এ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর দপ্তরে আমাকে একবার যেতে হয়েছিল। প্রয়োজন হল কর্মসচিবের সঙ্গে দেখা করা। নাম পাঠিয়ে দেবার আধ মিনিটের মধ্যে তাঁর কামরায় ডাক পড়ল আমার, দেড় মিনিটের মধ্যে কাজটি সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যে সেই সাহিত্যিক কর্মসচিবের চরিত্র

বই বইয়ের ঠিকানা

আমি অনুভব করেছিলুম। শাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট পরা প্রৌঢ় মুখের ভাবটি প্রথমে একটু কঠোর মনে হয়, যাকে বলে 'কাজের লোক' সেই রকম তাঁর ধরন ধারণ কিন্তু ওরই মধ্যে মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্যকিছুর ঝিলিক দিচ্ছেন — তাঁর স্বভাবের গভীরতর উদ্ভাস যেন। দেখে চমৎকৃত হলুম যে অফিসের খাতায় পরিষ্কার বাঙ্গালা হরফে তিনি স্বাক্ষর করলেন।[১২]

ভবানী মুখোপাধ্যায়

'মৃত্যুতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কাগজে ফুলওলা ছবি ছাপা হবে না। হরিবোলের বীভৎস চীৎকার নয়, শববাহকেরা পাড়া প্রতিবেশীদের আতংকিত করবে না। নীরব শবযাত্রার ব্যবস্থা হবে, কোনো হৈ চৈ নয়। সেখানেও সেই পরিমিতি বোধ।'[১৩]

মনোজ বসু

'ব্যক্তিগত জীবনে রাজশেখর কূর্মধর্মী মানুষ। অন্তরঙ্গের সংখ্যা নিতান্তই পরিমিত। সৌম্য দর্শন, পরম শান্ত, শুচিবেশ, আচরণে অতিশয় ভদ্র। কিন্তু স্বল্পবাক হলেও রসমধুর প্রত্যয়শীল কথাবার্তা। চিন্তার মধ্যে সামান্যতম জড়িমা নেই।'[১৪]

মনোরঞ্জন গুপ্ত

'যাঁরা তাঁর লেখা গল্প পড়েছেন তাঁরা জানেন যে তিনি মিস্ত্রিদের ব্যবহৃত 'বাক্য' সুবিধা পেলেই ব্যবহার করতেন। — যেন বিষয়টি বোঝবার ও বুঝবার পক্ষে ওতেই সুবিধা। এবং সত্যিই আমরা সহজে বুঝতাম। দেখুন, যে নম্বরী ফাইন সিরিষ বা এমারী পেপার হাতে থাকলে তবে মিস্ত্রি ফাইন পালিশ করতে পারে, শরৎবাবুর (চট্টোপাধ্যায়) হাতে তা ছিল না।[১৫]

যতীন্দ্রকুমার সেন

'আমি ছেলেবেলা থেকে ছবি এঁকে আসছি। তবু অনেকসময় তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির কাছে হার মেনেছি। কুঁড়ে ঘর, পাকা বাড়ী, কলকব্জা এবং কাঠ বা পাথরের তৈরী জিনিষে তিনি অপরূপ এক সৌন্দর্য দেখতে পেতেন, বলতেন, "জানো যতীন, শালিখ পাখীর রং ঠিক ভাজা ছোলার মত, শ্যামবর্ণ বাঙ্গালীর রং নতুন সেগুনকাঠের সঙ্গে বেশ মেলে, টিয়া পাখির লেজে দুটি নীল পালক আছে, মুসুর ডালের চেহারা অতি সুন্দর — গহনায় বসান যায়।" এমন কি কাকের রূপ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। বলতেন, "কাকের বর্ণ সুষমা চমৎকার। ওপরটা কাল, নীচে ছাই রঙ — বর্ণ শাস্ত্রসম্মত

সমাবেশ।' ... "মোরগের রূপ অতি সুন্দর। হলে কি হবে লোকে খেয়েই শেষ করে দেয়। তার চেয়ে পুষলে অনেক ভাল করত।"[১৬]

যদুনাথ সরকার

'... তাহার নির্ম্মল হাস্যে কাহারও অন্তরে বেদনা রাখিয়া যায় না। এই জন্যই না কালিদাস পরশুরামকে "স-সোম ইব ধর্ম্ম দীধিতি' ... অর্থাৎ একাধারে সূর্যের খর দীপ্তি ও চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতির সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। ... আমাদের অন্তঃপুরে 'লম্বকর্ণ' বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। ... লম্বকর্ণের দাড়ির মতো এই গড্ডলিকার শ্রেণী আরও বাড়িতে থাকুক, বঙ্গীয় পাঠকের একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা বৃদ্ধি হউক।'[১৭]

যশেন্দ্রকিশোর গুপ্তরায়

'রাজশেখরবাবু সব কাজই পরিকল্পনা মত করতেন। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, সামাজিক উৎসব সবকিছু কাজে পরিকল্পনা লিখে দিতেন। কে বাজার করবে, কে ভাঁড়ার দেখবে, কে রান্নার তদারক করবে, কে অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে, কোন জিনিষ কতটা কেনা হবে, কতজন আসবে, কতজন পরিবেশন করবে সবই লেখা থাকত। তখনকার দিনে মেঝেয় আসন পেতে কলাপাতায় খাওয়া হত। তাঁর পরিকল্পনার খাতায় ঘরের মাপ আর ঐ কটা আসন পড়বে তাও আঁকা থাকতো। কলাপাতার সাইজও মোটামুটি থাকতো। শেষের দিকে একজনের ওপর, "ফ্যাচাং" এই নামের কাজের ভার থাকত। "ফ্যাচাং" হচ্ছে কয়েকজন যেমন,

(১) একজন অপেক্ষা করতে পারছেন না, এক্ষুনি চলে যাবেন। তাকে দৈ মিষ্টি দিয়ে দাও।

(২) মাছ মাংস খান না তাঁকে আলাদা খেতে বসাতে হবে।

(৩) পিতৃ বা মাতৃবিয়োগ হলে একবছর কোন নেমন্তন্ন খেতে নেই, অথচ লোভ জয় করতে না পেরে এসেছেন। তাঁর কাছে তামার পয়সা নিয়ে (খাবার মূল্য) তাকে খাওয়ানো।

(৪) ছোঁয়াছুঁইর জন্য স্বপাক খাবেন বা নিয়ে যাবেন তাঁর ব্যবস্থা করে দেওয়া।'[১৮]

শশিশেখর বসু

'যখন দ্বারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে 'বেগম' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হলো বল্লাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা।' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বই বইয়ের ঠিকানা

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেন্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বল্লেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেন্ট বল্লে, 'খাই না।' 'কখনও খান নি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।'

'আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বলল, 'রাজশেখর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে।' 'ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারত না।'[১৯]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'... তাঁর এক-একটি উক্তিকে বাঙ্গালীর রসবোধের এক-একটি হিমগিরিশৃঙ্গ বলা যায়। 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক, হয়, কিন্তু Zানতি পারো না, কচি-সংসদ, এংগ্লো-মোগলাই কেফ-এর ডবল-ডিমের রাধাবল্লভী আর মুর্গির ফ্রেঞ্চ মালপো, চ্যাম্পিয়ান ওয়ানলেগার, ... গোহিতায় গোভির্গবাং শাসনম্ ইত্যাদি ইত্যাদি ... কত কথার মধ্যে আধুনিক জীবনের সমালোচনা নিহিত রয়েছে।'[২০]

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

'বটেশ্বরের অবদান' গল্পে সঞ্জীব ডাক্তার মন্তব্য করিয়াছেন, 'হার্ট খারাপ হয় তো চিকিৎসা করাবেন, ডিজিটালিস, অ্যামিনোফাইলিন, থেলিন এই সব দেবেন।' আমি ডাক্তার নই ; তবু এই প্রেসক্রপশনে একটু সংযোজন করিতে চাই। হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ওষুধ যাই দেওয়া হউক, অনুপান হিসাবে পরশুরামের গল্পপাঠের ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।'[২১]

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

'একদিন রাজশেখরবাবু আপেক্ষিকবাদ বুঝাইতে বসিলেন। আধুনিক Field Theory ছাড়িয়া দিলে Theory of Relativity-র মতো জটিলতত্ত্ব বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে আর দুটি নাই। তিনি এই সুকঠিন তত্ত্বটিকে এমন সরল করিয়া সহজ বুদ্ধি গ্রাহ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, আজ ভাবি, যদি তাহা তখন লিখিয়া লইতাম তাহা হইলে একটি অপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সমৃদ্ধ হইত।'[২২]

সৈয়দ মুজতবা আলী

'রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে আমি অফুরন্ত কথা বলতে পারি। কারণ তাঁর লেখা আমি এত শ্রদ্ধার সঙ্গে এত অসংখ্যবার পড়েছি যে এমন একটা লাইনও কেউ বলতে পারবে না যেটার আগের এবং পরের ছত্র আমার অজানা।'[২৩]

রাজশেখর : নানা চোখে

উৎস-নির্দেশ

'যষ্টিমধু', বৈশাখ ১৩৬৭ সংখ্যা : ১-৪, ৭-৯, ১৩-১৫, ১৭

'কথা সাহিত্য' শ্রাবণ ১৩৬০ সংখ্যা : ৫, ৬, ২০, ২২

'রূপনারায়ণের কূলে', ২য় খণ্ড : ৪

'পরশুরাম রচনাবলী' ১ম খণ্ড, 'ভূমিকা' : ১০

'কোরক' বইমেলা ১৯৯৫ সংখ্যা : ১১

'সঙ্গ : নিসঃঙ্গতা / রবীন্দ্রনাথ' : ১২

কল্যাণী ঘোষ, 'রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য' : ১৬, ১৮

'শারদীয় যুগান্তর' ১৩৬০ : ১৯

'হাস্যরসিক পরশুরাম', 'ভূমিকা' : ২১

'সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী', একাদশ খণ্ড, অপ্রকাশিত পত্রাবলী : ২৩

বই বইয়ের ঠিকানা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অজিত দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস', জিজ্ঞাসা, ১৯৬০

অমলেন্দু ঘোষ সম্পাদিত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ', আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি, ১৯৮৫

এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রকাশিত রাজশেখর বসু / পরশুরামের বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাবলী

কল্যাণী ঘোষ, 'রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য', ফার্মা কেএলএম, ১৯৮৩

'কথা সাহিত্য', রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬০

'কোরক', রাজশেখর বসু সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৫

গিরীন্দ্রশেখর বসু, 'পুরাণ প্রবেশ', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, (ভূমিকায় তারিখ : ২৯ আশ্বিন, ১৩৪১, মহাষ্টমী)

গিরীন্দ্রশেখর বসু, 'লাল কালো', প্রকাশক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুদ্রক : সজনীকান্ত দাস, প্রবাসী প্রেস, ১৩৩৭

গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের কূলে', দ্বিতীয় খণ্ড, পুথিপত্র, ১৯৮৮

চন্দ্রশেখর বসু, 'ধবু বসু বংশ পত্রিকা অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ী শ্রেণীর অন্তর্গত মাইনগর সমাজের ও মুক্তি বসুর শাখা স্বরূপ কনিষ্ঠ ধবু বসুর বংশবলির নির্ঘন্ট পত্র', গ্রন্থের ভূমিকায় তারিখ ও স্থান : ১লা বৈশাখ ১২৯১, খড়গপুর, মুঙ্গের

দীপংকর বসু সম্পাদিত 'পরশুরাম গল্প সমগ্র', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৯৯২

দীপংকর বসু সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত রাজশেখর', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, ১৯৮২

দীপেন সাহা, 'রাজশেখর বসু', বাগর্থ, ১৯৭২

দেবজ্যোতি দাশ, 'গিরীন্দ্রশেখর বসু', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০২

পরিমল গোস্বামী, 'দ্বিতীয় স্মৃতি', প্রতিক্ষণ সংস্করণ, ১৯৯৪

পরিমল গোস্বামী, 'পত্রস্মৃতি', নবগ্রন্থনা, ১৯৭১

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, ১-৪ খণ্ড, বিশ্বভারতী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৫

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'আত্মচরিত', শৈব্যা সংস্করণ, ১৯৯৮

প্রমথনাথ বিশী, 'ভূমিকা', পরশুরাম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, ৫সং ১৯৯৫

'যষ্টিমধু', পরশুরাম স্মৃতি সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭

শতদল গোস্বামী, 'রসিক সাহিত্যিক শশিশেখর বসু', 'দেশ' ২৫ জুন ১৯৯৮ সংখ্যা

শশিশেখর বসু, 'রাজশেখরের ছেলেবেলা', শারদীয় যুগান্তর ১৩৬০

'সরকারি কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা', প.ব. সরকার প্রকাশিত, ২য় সং, ১৯৫৮

'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬

সুধীরচন্দ্র সরকার, 'আমার দেশ আমার কাল', এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৩৭৫

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'মনীষী স্মরণে', জিজ্ঞাসা, ১৯৯০

সুশীল রায়, 'মনীষী জীবন-কথা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৩

সৃজননাথ মিত্রমুস্তৌফী, 'উলা বা বীরনগর'; '২৭। ৪ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত' ১৩৩৩

'সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী', একাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৫